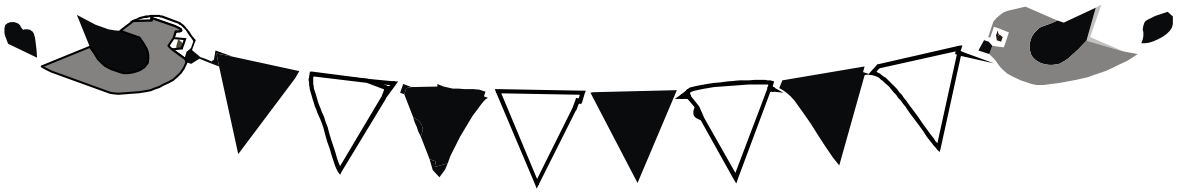

জেলার খবর সমীক্ষা

ঃ দ্বাদশ শারদ সংখ্যা ঃ

মহালয়া // ৮ অক্টোবর, ২০১৮ // সোমবার

ঃ সূ চি প ত্র ঃ

১. মলাট কথা ঃ	রকমারী বারো	জহর চট্টোপাধ্যায়	৪-৭
২. শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ	স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতে শিক্ষা	জ্যোতি ভট্টাচার্য	৮ - ১২
৩. স্বাধীনতার কথা ঃ	উপেক্ষিত স্বাধীনতার বীর সেনানীরা		
	উপেক্ষা জাতিগত না স্বেচ্ছাকৃত -	মনামী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩-১৪
৪. নিবন্ধ কথা ঃ	উপনিবেশের চোখ	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫-১৬
৫. রম্য কথা ঃ	রঙ্গ-রসিকতায় বারো খ্যাতনামা	তাপস বাগ	১৭-১৮
	কথার লব্‌জ বা মুদ্রাদোষ	পল্টু ভট্টাচার্য্য	১৯-২০
৬. স্মৃতিকথা ঃ	যোগীন্দ্রনাথ ঃ		
	রত্নদ্বীপে পৌছানোর রূপময় মান্দাস	শ্যামল বেরা	২১-২২
	নারায়ণ চন্দ্র রানা ঃ *এক ধূমকেতু জীবন*	প্রদীপ ভট্টাচার্য	২৩-২৬
৭. বিজ্ঞান কথিকা ঃ	প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সভ্যতার সংকট	সুকান্ত মুখোপাধ্যায়	২৭-২৯
৮. মুশকিল আসান ঃ	হাতের লেখার সঠিক দিশা	মহুয়া দাস চট্টোপাধ্যায়	৩০
	মেডিটেশন	মৌসুমী চক্রবর্ত্তী	৩১-৩২
৯. গল্প কথা ঃ	শেষ সময়ে	উত্তম কুমার পাল	৩৩-৩৪
	দীক্ষা নিলেন পরমেশ্বর -	উপল পাত্র	৩৫ -৪০
১০. ভ্রমণ কথা ঃ	কাছেপিঠের ছয় ভ্রমণ	সুজয় বাগচী	৪১-৪৩
১১. কবিতা ঃ	প্রতারক	সারনাথ হাজরা	৭
	বারোর নামতা	প্রণব দাস	৭
	হাঁচির জারিজুরি	মালতী দাস	১৬
	ছন্দ-সূর্য ভবানীপ্রসাদ	কল্যাণ দাশগুপ্ত	২২
	প্রকৃতি	বিক্রমজিৎ ঘোষ	২৯
	সেবক	উদয়শঙ্কর বাগ	২৯
	অসুর যাবে শ্বশুরবাড়ি	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	৩৪
	আগমনীর আগমণ	মিত্রা ঘোষ	৩৪
	নেতাজী স্মরণে	রামকৃষ্ণ বেরা	৪৪
	আমার ইচ্ছে	সুনন্দা হাজরা	৪৪
১২. ছোটদের পাতা ঃ	ইন্দ্রপতন ও নতুনত্বের রাশিয়া বিশ্বকাপ	সুরজিৎ দাস-	৪৫ - ৪৬
	এগিয়ে চলা	শঙ্কর চক্রবর্ত্তী	৪৬
	আমার থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ	সায়নী চ্যাটার্জ্জী	৪৭
	আমার শিক্ষাগুরু	রাজদীপ ঘোষ	৪৭
	ছবির পাতা		৪৮

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে বারো বছর হয়ে গেল। শারদ সংখ্যারও তাই বারো বছর পূর্তি। এবারের বিষয় বারো রকম ভিন্ন স্বাদের রচনা। গত কয়েকবছর ধরেই শারদ সংখ্যা বিষয়ভিত্তিক হয়েছে এবং খুবই আনন্দের কথা পাঠক-পাঠিকারা সানন্দে সেগুলি গ্রহণ করেছেন। শারদ সংখ্যা ছাড়াও পত্রিকার যে কটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যেমন, পঞ্জিকা, আম, সুকুমার রায়, গণেশ, কিশোরকুমার, রাহুলদেব বর্মণ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি সবই নিঃশেষিত হয়েগেছে। এই কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য লেখকদের যাঁরা তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতি বছরের মত এবারও শুধুমাত্র ভালবাসার টানে তাঁরা লেখা দিয়েছেন।

ছোট পত্রিকা প্রকাশের ঝক্কি অনেক। প্রথমত বিজ্ঞাপন পাওয়া দুষ্কর, কাগজের দাম ও ছাপাই খরচ বাড়ায় পত্রিকা প্রকাশের খরচও বেড়েছে। তা সত্ত্বেও পত্রিকার দাম বাড়েনি। পাঠক-পাঠিকা, লেখককুল, শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আজও পত্রিকা টিকে আছে। আশাকরি ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। সকলের জন্য রইল শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

With Best Compliments From

A WELL WISHER

SAROJIT MANNA

সুর ও কথা

আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক শিক্ষা কেন্দ্র

ঃ প্রতি শনিবার ঃ

মাধব ঘোষ লেন, খুরুট,

ঃ প্রতি রবিবার ঃ

ডুমরাজলা, এইচ. আই. টি. কোয়াটার্স

যোগাযোগ - ৮০১৩৩৭৮১৬৫/৯৮৩০৪৭৬০২০

'জেলার খবর সমীক্ষা'র গ্রাহক হন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা

লেখা পাঠান,
মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।
পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।

যোগাযোগ করুন — সম্পাদকীয় দপ্তরে,
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ভাতেঘরী

জনকল্যাণ সমিতি

ভাতেঘরী, জয়পুর,
হাওড়া - ৭১১৪০১
মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

রকমারী বারো

জহর চট্টোপাধ্যায়

বারো কথাটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ধারাপাত বইতে। এক-এ চন্দ্র, দু-এ পক্ষ করে দশ-এ দিক শেখার পর, এক দশ এক এগারো, এক দশ দুই বারো। কিন্তু বিষয় হিসাবে বারোকে চিনেছি সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে ; অর্থাৎ তাঁর লেখা 'বারো সিরিজ' থেকে। 'এক ডজন গপ্পো', 'আরো এক ডজন', 'আরো বারো', 'এবারো বারো'র পর সবাইকে অবাক করে তিনি পরের বইটির নাম দিলেন 'একের পিঠে দুই'। কোন ছোটবেলায় এক দশ দুই বারো মুখে বলার সঙ্গে স্লেটে লিখতাম একের পিঠে দুই, কিন্তু বারো মানে যে একের পিঠে দুই তা ভুলেই গিয়েছিলাম। এ বছর শারদ সংখ্যার দ্বাদশ বর্ষে তাই বারোর রকমফের একবার খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম। আমাদের চারপাশে চেনা অচেনা হাজারো জিনিসের মধ্যে বারো ছড়িয়ে আছে। সেই বারো-ইয়ারীদের নিয়েই এবারের মলাট কথা।

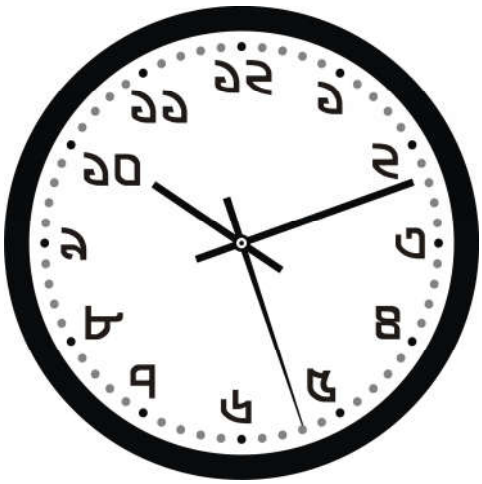

বারোটি মাস পার হলে হয় এক বছর। আবার বারো বছর সময়কে এক যুগ ধরা হয়। এক দিনে চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু ঘড়ি হিসাব রাখছে বারো ঘন্টার। সময় মাপতে যেমন বারোর হিসাব, দৈর্ঘ্য মাপতেও তেমন বারো। বারো ইঞ্চিতে এক ফুট। এবার গুনতিতেও বারো। কোনো জিনিস বারোটা নিলে এক ডজন জিনিস নেওয়া হল। আবার বারো ডজন জিনিস হলে তাকে এক গ্রোস বলে। তবে ব্যতিক্রমও আছে, 'বেকার্স ডজন' কিন্তু বারোটায় নয়, তেরোটায়। সকালের কাগজে রাশিফল দেখে দিন কেমন যাবে হিসাব করুন বা না করুন; রাশিচক্রে বারোটি রাশি। জ্যোতিষ বিধানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকলেও রাশির সংখ্যা দুজনেরই এক। ভারতীয় রাশিগুলি হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন। পাশ্চাত্য মতে বারোটি রাশির নাম হল এরিস, টরাস, জেমিনি, ক্যান্সার, লিও, ভার্গো, লিব্রা, স্কর্পিয়াস, স্যাগিটেরিয়াস, ক্যাপ্রিকর্ণ, অ্যাকোয়ারিস এবং পিসিস্। চিনা রাশিচক্রেও বারোটি পশু। এরা হল ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া, হনুমান, মোরগ, কুকুর, শুয়োর।

সব ধর্মেই বারো সংখ্যাটির সংযোগ রয়েছে। হিন্দু ধর্মে বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। একে বলে 'পূর্ণ কুম্ভ'। চারটি স্থানে 'পূর্ণ কুম্ভ' অনুষ্ঠিত হয় — হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। বারোটি 'পূর্ণ কুম্ভ' হওয়ার পর, অর্থাৎ ১৪৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় 'মহা কুম্ভ'। দেবাদিদেব মহাদেবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। শিবের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করে এই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ। এরা হল সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, কেদারনাথ, ভীমশঙ্কর, বিশ্বনাথ, ত্র্যম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর, ঘুমেশ্বর। হিন্দু ধর্মে প্রধান উপাস্য দেব-দেবী বারো জন। এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, হনুমান, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, স্কন্দ, সূর্য। হিন্দু দেব-দেবীদের 'অষ্টোত্তর শতনাম'-এর মতই গুরুত্বপূর্ণ হল 'দ্বাদশ নাম'। বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম হল কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, ঋষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। দেবী লক্ষ্মীর দ্বাদশ নাম হল শ্রী, অমৃতোদ্ভবী, কমলা, লোকসুন্দরী, বিষ্ণুপত্নী, বৈষ্ণবী, বরারোহী, হরিবল্লভী, সারঙ্গিনী, দেবদেবীকা, লক্ষ্মী এবং হরিপ্রিয়া। সূর্যের বারোটি নাম হল সূর্য, অর্ক, আদিত্য, ভানু, সাবিত্রী, পূষণ, রবি, মার্তণ্ড, মিত্র, বিবস্বান, ভাস্কর এবং হিরণ্যগর্ভ। বিষ্ণু পুরাণ মতে বারো জন আদিত্য। এঁরা হলেন অংশ, আর্যমন, ভগ, ধুতি, মিত্র, পুশান, শক্র, সবিত্র, ত্বস্ত, বরুণ, বিষ্ণু এবং বিবস্বাত। হিন্দু যোগ, শাক্ত এবং বৌদ্ধ তন্ত্রে যে অনাহত চক্র ব্যবহার হয় তাতে বারোটি পাপড়ি আছে। সংস্কৃত ভাষায় এই বারোটি পাপড়ির নাম কম, খম, গম, ঘম, ঙম, চম, ছম, জম, ঝম, ন্যম, তম, থম। এগুলি মানুষের রিরংসা, ছলনা, দ্বিধা, অনুতাপ, প্রত্যাশা, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, নিরপেক্ষতা, দাম্ভিকতা, অযোগত্যা, বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব'র মত মানসিক অবস্থাগুলিকে নির্দেশ

করে। বৌদ্ধ ধর্মে বারোজন দেব আছেন। এঁরা হলেন নিত-তেন (সূর্য্য), তাইশাকু-তেন (ইন্দ্র), কা-তেন (অগ্নি), এমা-তেন (যম), রাসেত্সু-তেন (নির্তী), ফু-তেন (বায়ু), ইশানা-তেন (ইশান), তামন-তেন (কুবের), সুই-তেন (বরুন), বন-তেন (ব্রহ্ম), চি-তেন (পৃথ্বী), গৎ-তেন (চন্দ্র)। বাইবেলের সঙ্গে বারো সংখ্যাটির গভীর সংযোগ। যীশু বাবা-মা'র সঙ্গে প্রথমবার জেরুজালেমে আসেন বারো বছর বয়সে। নিউ টেস্টামেন্ট বলছে যীশুর বারো জন শিষ্য ছিল। এরা হলেন পিটার, অ্যান্ড্রু, জেমস, জন, ফিলিপ, বার্থেলোমিউ, ম্যাথু, টমাস, জেমস(২য়), থেডুয়াস, সাইমন এবং জুডাস। যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার পর জুডাস অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে এবং ম্যাথিয়াস দ্বাদশ শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত হন। বাইবেলে মোট বারো বার মেরী ম্যাগদালেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যীশুর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর থেকে বারো দিন খ্রিষ্টানরা 'ক্রিসমাস' পালন করেন। নতুন বছরের ৫ জানুয়ারি তারিখে ক্রিসমাস পালনের বারো দিন হয়। 'দ্য টুয়েলভ ডেজ অফ ক্রিসমাস' নামের ক্যারলটিতে উপহার দেওয়ার জন্য বারোটি জিনিসের উল্লেখ আছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে জেকবের বারোটি সন্তান ইজরায়েলে বারোটি উপজাতির সূচনা করে। এই বারোটি উপজাতি হল রুবেন, সিমিওন, লেভি, জুডা, ডান. নাপথালি, গাড, আসের, ইসাচার, জেবুলন, জোসেফ এবং বেঞ্জামিন। ইসলাম ধর্মে বারো জন ইমাম। হজরত মহম্মদের পর একে একে আলি, হাসান, হুসেন, জায়নাল আবেদিন, মুহম্মদ আল বাকির, জাফর আল সাদিক, মুসা আল কাজিম, আলি আল রিধা, মুহম্মদ আল তাকি, আলি আল নাকি, হাসান আল আসকারি, মুহম্মদ মাহদি ইমাম হন। গ্রিক পুরাণে বলা হয়েছে অলিম্পাস পর্বতে বারো জন প্রধান দেবতার বাস। এঁরা হলেন জিউস, হেরা, পসাইডন, এরিস, হার্মেস, হেফাইসতোস, অ্যাফ্রোদিতি, এথেনা, অ্যাপেলো, অর্তিমিস, দেমেতের এবং হেসতিয়া। জিউসের সন্তান বীর হারকিউলিসকে বারোটি অসম্ভব কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। নর্স পুরাণের প্রধান দেবতা ওডিনের বারোটি সন্তান। ওডিনের নাম থেকেই ইংরাজি 'ওয়েনেস ডে' নাম হয়েছে।

বাংলা ভাষায় বারোর পূরণবাচক শব্দ দ্বাদশ। ইংরাজি ভাষায় এই শব্দটি বোঝানো হয় 'টুয়েলভ্থ', 'ডজনেথ্' এবং 'ডুয়োডেসিমাল' শব্দ দিয়ে। ইংরাজি 'টুয়েলভ্থ' শব্দটির বেশ কিছু বৈশিষ্ট আছে। যেমন এটি ইংরাজি ভাষার এক পদাংশের বা সিলেবলের বৃহত্তম সংখ্যা। 'ওয়ার্ড গেম' স্ক্রাবেলে 'টুয়েলভ্থ' শব্দটির মানও ১২। গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত আর একটি ইংরাজি শব্দ 'ডোডেকা' উপসর্গ হিসাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারো সম্পর্কিত কিছু জিনিসকে বোঝায়। যেমন, বারোটি বাহু বিশিষ্ট বহুভুজকে ডোডেকাগন, বারোটি সমতল বিশিষ্ট ঘনবস্তুকে ডোডেকাহেড্রন, বারোটি দ্বীপের সমষ্টিকে ডোডেকানিস্ বলে। বিশ্ব ভাষা এসপারান্তোতে বারোকে বলে দেক দু। ওলন্দাজ ভাষায় তাল্ফ, চেক ভাষায় ডেভানাৎস, ফরাসী ভাষায় দুজ্, জার্মান ভাষায় সোয়েফ, গ্রিক ভাষায় দোদেখা, ল্যাটিন ভাষায় দুওদেচিম, রাশিয়ান ভাষায় দ্রেনাৎসিচ, স্প্যানিশ ভাষায় দোয়াফে, সোহিলি ভাষায় কুমি না বিলি, তুর্কি ভাষায় ওন ইকি এবং জুলু ভাষায় ইশুলি নাম্বিলি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বারোর নামও বিভিন্ন। হিন্দীতে বারাহ্, আরবিতে এফনাই আসার, মালায়ালম ভাষায় পানত্রানত্, মারাঠি ভাষায় বারা, তামিল ভাষায় পান্নিরান্ডু, তেলুগু ভাষায় পান্নিন্ডু। ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালে নেপালি ভাষায় বারোহ্, শ্রীলংকায় সিংহলি ভাষায় দোলোস।

২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখটি সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল কারণ সে দিনের তারিখটি লেখা হচ্ছিল ১২/১২/১২। ওই তারিখের বেলা ১২ টা বেজে ১২ মিনিট ১২ সেকেণ্ড সময়টিও একই রকম ভাবে লেখা হয়েছিল ১২: ১২: ১২। সময় ও তারিখ মিলিয়ে সেদিন সবচেয়ে বেশী ১২ সংখ্যাটি ব্যবহার হয়েছে, যা অন্য আর কোনোদিন হয় নি। এই আশ্চর্য তারিখ ও সময়ক্ষণটি কিয়াম মোরিয়ার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার জন্মপঞ্জিতে জন্মের তারিখ লেখা আছে ১২/১২/১২ এবং জন্মমুহূর্ত ১২: ১২। ১২/১২/১২ এই ধরনের তারিখকে 'পুণরাবর্ত তারিখ' বা 'রিপিটিং ডেট' বলে। প্রতিটি শতাব্দীর প্রথম ১২ বছরে এমন ধরণের তারিখ দেখা যায়।

বিজ্ঞান এবং গণিতে বারো সংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পরে। গণিতে ১২ একটি যৌগিক সংখ্যা। কিন্তু যে সব যৌগিক সংখ্যার ছয়টি উৎপাদক আছে তাদের মধ্যে ১২ ক্ষুদ্রতম। ১০ সংখ্যাটির ১২ ঘাতকে অর্থাৎ একের গায়ে বারোটি শূণ্যকে (১০০০০০০০০০০০) ইংরাজিতে 'ট্রিলিয়ন' বলে। বাংলায় সংখ্যাটি হবে এক লক্ষ কোটি। আবার, ১২ সংখ্যাটির ১২ ঘাত হবে ২৯১৬১০০৪৪৮২৫৬। জ্যামিতিক ঘনবস্তু ঘনকের বারো টি ধার। একইভাবে, ত্রিভুজাকার অষ্টতলক বা অক্টাহেড্রনেরও বারোটি ধার। দশের গুণিতকে দশকিয়া বা ডেসিমাল হিসাবের মতই কোনো কোনো দেশে বারোর গুণিতকে দ্বাদশিয়া বা

ডুওডেসিমাল হিসাবের প্রচলন ছিল। ১২ সংখ্যাটি বাইনারি পদ্ধতিতে লিখলে হয় ১১০০, ট্রাইনারি পদ্ধতিতে ১১০, কোয়াট্রেনারি পদ্ধতিতে ৩০, কুইনারি পদ্ধতিতে ২২, সেনারি পদ্ধতিতে ২০, অক্টালপদ্ধতিতে ১৪। পর্যায় সারণীর বারো নং মৌল ম্যাগনেসিয়াম যার পারমাণবিক সংখ্যা ১২। বর্ণালি চক্রে বারোটি মৌলিক রং আছে — তিনটি প্রাথমিক রং (লাল-হলুদ-নীল), তিনটি দ্বিতীয় স্তরের রং (কমলা-সবুজ-বেগুনী), ছয়টি তৃতীয় স্তরের রং। কম্পিউটারের 'কালার হেক্স'-এ # ১২১২১২ দিলে যে ধূসর রংটি তৈরী হয় তাতে নীল, লাল এবং সবুজ রং সমান পরিমানে থাকে। প্রায় সব কম্পিউটারে ১২টি 'ফাংশান কী' (F-১ থেকে F-১২) থাকে। সাধারণ ডিজিটাল মোবাইলে বারোটি 'নাম্বার কী' থাকে — ১ থেকে ৯, ০, #, *। মানুষের শরীরে পাঁজরের হাড় বারো জোড়া এবং মস্তিষ্ক থেকে বারোটি স্নায়ু নির্গত হয়েছে। মানুষের পেটের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনাম অংশের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি। ল্যাটিন ভাষায় বারোকে দুওদেচিম বলে সে তো আগেই বলেছি। এই দুওদেচিম থেকেই ডিওডিনাম শব্দের উৎপত্তি। বিজ্ঞানী উইলহেল্ম হেনরিক স্কুয়েসলার ১২ রকমের বায়োকেমিক্যাল লবণ ব্য কোষিয় লবণের তালিকা তৈরী করেছেন। ঝড়ের গতি মাপার 'বিউফোর্ট উইণ্ড ফোর্স স্কেল'-এ হ্যারিকেন ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিকে ফোর্স-১২ বলে।

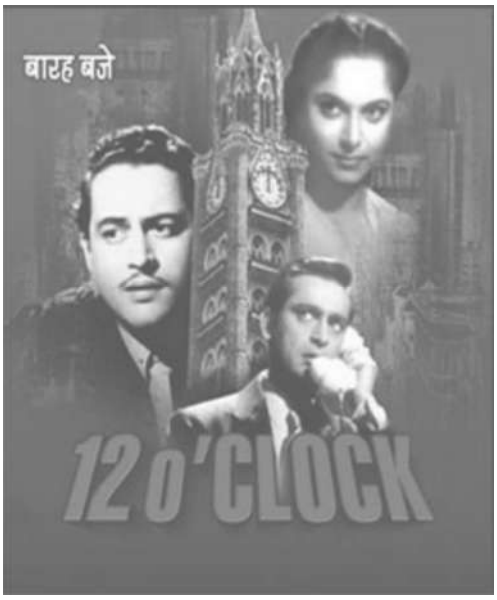

সিনেমা, থিয়েটার, নাটক, নভেলেও বারোর উপস্থিতি। জন মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যগ্রন্থ বারোটি গ্রন্থের সংকলন। 'বেন হুর' ছবিটি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে ১২টি নমিনেশন পায় এবং ১১টি পুরস্কার জেতে। এই ছবির পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার ১২বার সেরা পরিচালকের জন্য মনোনিত হয়ে ২বার পুরস্কার জেতেন। রাশিয়ান পরিচালক নিকিতা মিকালকভ '১২' ছবির জন্য ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার পান। ১৯৫৭ সালে আমেরিকায় তৈরী হয় 'কোর্ট রুম ড্রামা' ছবি 'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন', যার পরিচালক ছিলেন হেনরি ফণ্ডা। ১৯৯৭ সালে পরিচালক উইলিয়াম ফ্রায়েডকিন একই নামে ছবিটি আবার তৈরী করেন। ১২ জন জুরির নেতৃত্বে একটি বিচারের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। 'দ্য টুয়েলভ চেয়ার' গল্পটিকে ভিত্তি করে ১৯৭০ সালে আমেরিকায়, ১৯৭১ এবং ১৯৭৬ সালে রাশিয়ায় একই নামে ছবি হয়। অন্য কয়েকটি ছবির মধ্যে 'টুয়েলভ মাংকিস'(১৯৯৫), 'ওসানস টুয়েলভ' (২০০৪), 'টুয়েলভ' (২০১০), 'টুয়েলভ ইয়ার্স এ স্লেভ'(২০১৪) এবং ১৯৬৭ সালে তৈরী আমেরিকার সমরচিত্র 'দ্য ডার্টি ডজন'। 'সবার উপরে' ছবিতে ছবি বিশ্বাসের 'ফিরিয়ে দাও আমার বারোটি বছর', সংলাপটি বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৫৮ সালে হিন্দী ভাষায় তৈরী হয় 'টুয়েলভ ও ক্লক' ছবিটি। ছবির পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী এবং অভিনয় করেন গুরু দত্ত-ওয়াহিদা রহমান।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পতাকায় ১২টি তারা আছে। লণ্ডনে 'ক্লিওপেট্রাস নিডল' নামে যে স্মৃতি স্তম্ভটি আছে তার নিচে একটি 'টাইম ক্যাপসুল' পোঁতা রয়েছে। সেই ক্যাপসুলের মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে লণ্ডনের সেরা বারো জন সুন্দরীর ছবিও রাখা হয়েছে। তবে কোন বারো জন সুন্দরীর ছবি তা গোপন রাখা হয়েছে। স্পেন ও দক্ষিন আমেরিকার মানুষেরা সারা বছর সৌভাগ্য লাভের জন্য নতুন বছরের ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২টি আঙুর খেয়ে ফেলেন। ১২টি আঙুরের প্রতিটি এক একটি মাসকে নির্দেশ করে। হাওয়াইয়ান বর্ণমালায় ১২টি বর্ণ। ৫টি স্বরবর্ণ এবং ৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ। ভারতের ১২তম রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল ছিলেন দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি। ভারতের ১২তম প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া। আমেরিকার ১২তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন জ্যাকারি টেলর। তিনি পেটের রোগে মারা যাওয়ায় মাত্র ১৬ মাস রাষ্ট্রপতি ছিলেন। হিন্দুস্থানী এবং কর্ণাটকী — উভয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বারোটি স্বর। সাতটি শুদ্ধ স্বর এবং পাঁচটি কড়ি-কোমল স্বর। এরা হল সা, রে, ঋ, গা, জ্ঞ, মা, ম্না, পা, ধা, দ, নি, ণি। মহাভারতে পাণ্ডবরা দ্যুতক্রীড়ায় হারের শর্ত পূরণে বারো বছরের জন্য বনবাস এবং বারো মাসের জন্য অজ্ঞাতবাসে যান।

আজ পর্যন্ত ১২ জন মানুষ চাঁদে পা ফেলেছেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসাবে চাঁদে পা দেন নীল আর্মস্ট্রং, দ্বিতীয় এডুইন অলড্রিন। এঁরা দুজনেই 'অ্যাপেলো-১১' চেপে চাঁদে গিয়েছিলেন। চাঁদে দ্বিতীয় অভিযানে যায় 'অ্যাপেলো-১২'। চাঁদে পা দেওয়া বাকি ১০ জন অভিযাত্রী হলেন পিটার কনরাড, অ্যালান বীন (অ্যাপেলো-১২), এডগার মিচেল, অ্যালান শেপার্ড (অ্যাপেলো-১৪), ডেভিড স্কট, জেমস্ আরউইন (অ্যাপেলো-১৫), জন ডব্লু ইয়ং, চার্লস ডিউক (অ্যাপেলো-১৬), ইউজিন কার্নান, হ্যারিসন স্মিট (অ্যাপেলো-১৭)।

শারদীয় প্রবন্ধে বারোর কথা শেষ করব 'বারোয়ারী' পুজোর কথা দিয়ে। 'বারোয়ারী' বা 'সর্বজনীন' পুজোই এখন বেশী। তা এই 'বারোয়ারী' শব্দটির মূলে আছে 'বারো' ও 'ইয়ার' শব্দ দুটি। প্রথম দিকে দুর্গাপূজা কেবল কলকাতার ধনী বাবুদের বাড়িতেই আয়োজন হত। পরে অন্যান্য অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু করেন। কথিত আছে, কোনো কারণে গুপ্তিপাড়ার একটি বাড়ীর পুজোয় সমাজের কিছু মানুষকে যোগদানে বাধা দেওয়া হলে তাদের মধ্যে বারো জন সকলের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে একটি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। কারো মতে ১৭৬১ সালে, আবার কারো মতে ১৭৯০ সালে এই পুজোটি হয়েছিল। সাল যাই হোক, বারো জন বন্ধু বা ইয়ারের উদ্যোগে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের বাইরে আয়োজিত পুজো বারো-ইয়ারী পুজো বা বারোয়ারী পুজো নামে পরিচিত। এই পুজো চালু হওয়ার পর ব্যক্তি উদ্যোগে পুজোর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং দুর্গাপূজা একটি গণ উৎসবে পরিণত হয়।

বারোর নামতা

প্রণব দাস

বারো	বারো গুণিতক এক বারো বছরে এক যুগ, ভেবে একটু দ্যাখ।
চব্বিশ	বারো গুণিতক দুই বারো ভুঁইয়া ছিলো বাংলায়, তাদের বারো ভুঁই।
ছত্রিশ	বারো গুণিতক তিন ঘড়ির কাঁটা বারো ঘন্টা, দু'বারে একদিন।
আটচল্লিশ	বারো গুণিতক চার এই বয়সে মায়ের হাতে খেয়েছি কত মার।
ষাট	বারো গুণিতক পাঁচ বাল্য পার কৈশোরে পা, পাই তার আঁচ।
বাহাত্তর	বারো গুণিতক ছয় বারো পেরিয়ে কলেজে ঢুকি, বাঁধন ছেঁড়া জয়।
চুরাশি	বারো গুণিতক সাত বারো মাসে এক বছর, ছয় ঋতুতে মাত।
ছিয়ানব্বই	বারো গুণিতক আট বারো মানে এক ডজন, পাঁচ ডজনে ষাট।
একশ আট	বারো গুণিতক নয় ক্রিকেট খেলায় দ্বাদশ ব্যক্তি, না থাকলেও হয়।
একশ বিশ	বারো গুণিতক দশ বারোর নামতা শেষ হলো এতটুকু ব্যস।

প্রতারক

সারনাথ হাজরা

আমি ওকে বলেছিলাম
এভাবে হয় না,
ও কিন্তু বিশ্বাস করেনি আমার কথা।
ওকে আমি বলেছিলাম
'ঐ ফাঁদে পা দিস্ না',
ও কিন্তু ওদের ফাঁদেই আটকে গেল।
অনেকবার ওকে বলেছিলাম
'অন্য ভাবে চেষ্টা কর'
ও ভাবলো ওকে আমি ভুল বোঝাচ্ছি।
কিন্তু আজ !
ও যখন একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে এলো,
বাবার রক্ত জলকরা একরাশ টাকা
আর মায়ের শেষ সম্বল হাতের নোয়া বেচা
পয়সা
সব শেষ হয়ে গেল,
বুঝলো সে ভীষণ ভাবে প্রতারিত।
এরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় এরা প্রতারক।
তাই এখন আর চোখের জল ফেলার সময় নয়,
করুণা হতাশা রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে
প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে হবে ঘরে ঘরে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতে শিক্ষা

জ্যোতি ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মানের বেশি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ওঁরা আমাকে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতে শিক্ষা' বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

এই উপলক্ষে বলার জন্য যেদিন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে আমার মনে আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোন অধিকারে আজ আমি এই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছি? আমি তাঁর অনুগামী নই, এমনকি এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিও আমি নই। আমি নিশ্চিত যে এখানে এমন অনেকেই উপস্থিত আছেন যাঁরা তাঁদের আরো বেশি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এ বিষয়টি বলতে পারবেন। না, কোনও মিথ্যা বিনয় দেখানোর ইচ্ছা আমার নেই। যাঁরা আমাকে জানেন, তাঁরা এটাও জানেন যে ভুল আমারও হয়, তাছাড়া আমি সত্যিই মনে করি না যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারব।

তবু, যাইহোক আমি যে সাহস করে এখানে দাঁড়িয়েছি, তার কারণ কয়েকটি বিষয়ে আমি প্রবলভাবে অনুভব করি। এবং সম্ভবত আমার এই প্রবল অনুভবের অন্যতম কারণ স্বামী বিবেকানন্দই। আমি একথা বলছি না যে প্রায় পঞ্চাশবছর আগে একটি কিশোর যখন সচেতন হয়ে উঠেছিল, যখন জেগে উঠেছিল তখন তিনি সেই 'গড়ে ওঠার সময়কার প্রভাব'-য়ে অন্যতম ছিলেন। আমার মত মানুষের বেলায় বা আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল সেই বিষয়ে 'গড়ে ওঠার সময়কার প্রভাব' কথাটি খুবই বেশি বড়ো কথা হয়ে যাবে। তবে এটা ঠিক যে বহু বছর ধরে আমি আমার মনে এক ব্যক্তিত্বকে বহন করেছি — যিনি ছিলেন সাহস ও শক্তির প্রতীক এবং তিনি এমন এক মানুষ যিনি প্রমাণ করেছিলেন যে আমাদের চারপাশের পরিবেশের অনেক কিছুই ঘৃণার যোগ্য এবং সব থেকে ঘৃণ্য হলো আত্মার দৈন্য। সেই মানসমূর্তিটি আমাদের এই আশ্বাস দিতেন যে আমরা আরো উন্নত হতে পারি, চারপাশের পরিবেশকে বদলাতে পারি এবং আমরা নীচতা ও ভীরুতা এবং দারিদ্র্য ও লোভের উর্ধ্বে উঠতে পারি, যা আমাদের দুর্বিসহ করে ও নীচ করে দেয় তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। এই প্রসঙ্গে যে শব্দটি আমার মনে আসছে তা হলো 'স্পর্ধা'। আমরা সাধারণভাবে এটাই শিখি এবং শেখাই যে 'স্পর্ধা' ব্যাপারটা খুব খারাপ, নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য। আমাদের সাধারণত 'বিচক্ষণতা' ও 'কাণ্ডজ্ঞান' শেখানো হয়। 'স্পর্ধা' শব্দটির অন্য অর্থ আমি অনেক পরে শিখেছি। এখানে আমি অবশ্যই সেই মহান ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবী কৌশলের গুরু দাঁতোকে উদ্ধৃত করছি। দাঁতো বলেছিলেন, "De I'audace, encore de I'audace, toujours de I'audace" স্পর্ধা, আরো স্পর্ধা এবং আবারও সবসময়ে স্পর্ধা। এই শব্দগুলি বারে বারে উদ্ধৃত করেছেন কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এবং ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আমার এই মানসমূর্তি যা আমি পঞ্চাশ বছর ধরে মনের মধ্যে ধরে রেখেছি, তাতে এই স্পর্ধা যেন গাঁথা হয়ে আছে। এখন আমি আপনাদের বলতে পারি শিক্ষা এই ধারণাটির মধ্যেই বেশ কিছুটা স্পর্ধা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে যা হওয়া সম্ভব তার থেকে মানুষকে আলাদা করে গড়ে তোলা বোধহয় আরো বেশি স্পর্ধার ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষায় উদ্দেশ্য অবশ্যই হতে হবে অবস্থার পরিবর্তন। মানুষের যে ভবিষ্যৎ আমরা গড়তে চাই সে বিষয়ে যদি অন্তর্দৃষ্টি না থাকে তবে শিক্ষা নিয়ে কোনো সদর্থক আলোচনাই হতে পারে না। কিন্তু আমাদের কী যোগ্যতা আছে যে আমরা এরকম একটা প্রচেষ্টা করব? কতটুকুই বা আমরা জানি? আমরা কী করে নিশ্চিত হব, যে শিক্ষা আমরা দিচ্ছি তা সঠিক লক্ষ্যে এগোচ্ছে এবং যে লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি তা

একটা কাঙ্খিত লক্ষ্য? তার থেকে বরং এই চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমরা কি স্বীকার করে নেব না যে আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ নশ্বরপ্রাণী, কী আমাদের অতীত কী ভবিষ্যৎ কিছুই জানি না অতএব শিক্ষাদানের সব প্রচেষ্টাই একটা ধৃষ্টতা? অজানার আতঙ্কে আমরা আতঙ্কিত হবো না কি?

বিজ্ঞানী পাস্কাল অসীম মহাশূন্যের নীরবতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ঐরকম সন্ত্রস্ত হওয়ার জন্য তাঁকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল, ঐ ধরনের ভয়ে ভীত হতে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন — যা এক অর্থে কোনও ভয়ই নয় — কারণ পাস্কালের চোখে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়েছিল যে মানুষ মহাজগৎকে অনুভব করতে পারে কিন্তু সেই মহাজগতের নিজের পক্ষে কোনোকিছু অনুভব করার ক্ষমতা নেই। তা না হলে ঐরকম একটা বই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হত না, অসীম মহাশূন্যের মতো নিজেও নীরব হয়ে থাকতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মুখ খুলেছিলেন এবং সেটাই হলো স্পর্ধার কাজ। স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্যের লেখা 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' -এ আমি পড়েছিলাম যে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যকে বলছেন — "যা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাই চেতন। চেতন সেটাই যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।" তাই বিদ্রোহ হলো শিক্ষার সংগঠক উপাদান। আমরা সকলেই জানি আমাদের শিক্ষার বেশিরভাগটাই রক্ষণশীল — যার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিধিনিষেধের নাগপাশে বাঁধা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, সমাজে বেঁচে থাকার সর্বজনগ্রাহ্য অথবা প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে মানুষকে খাপ খাইয়ে নেওয়ানো — নানাবিধ আচরণবিধি তৈরি করা। একইসঙ্গে এই সকল শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে আর একটি ধ্বংসাত্মক উপাদান — যা কিছু অনাকাঙ্খিত তাকে ধ্বংস করার আবেগকে জাগিয়ে তোলে। যে মানসমূর্তি আমি বহন করে চলেছি, তা সেই ধ্বংসাত্মক শিক্ষার মূর্তি। আমি এ বিষয়ে সচেতন যে বিবেকানন্দের যে মূর্তি আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চলেছি তা বিরাট এক সমগ্রের অংশমাত্র এবং হয়তো তা কিছুটা আমারই ভাবনাপ্রসূত। কিন্তু আমি যা অনুভব করেছি, কেবল সেটাই আমি বলতে পারি। সমগ্র বিবেকানন্দ সম্ভবত এক অত্যন্ত জটিল ব্যক্তিত্ব, যা কারোর একার পক্ষে একটি জন্মে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এখন শিক্ষা সম্পর্কে একটু বড়ো করে ভাববার জন্য আপনাদের অনুমতি চেয়ে রাখছি। আমার বক্তব্য হলো আমরা হয়তো শিক্ষাকে একটি জটিল, মিশ্র ত্রিমাত্রিক কাঠামো বলে ধরে নিতে পারি। একটা পর্যায়ে শিক্ষা হলো ধর্মীয় শিক্ষা, যা অতীতে ছিল এবং আজও আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনাই হলো এমন এক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেখানে ছাত্ররা পবিত্র ধর্মপুস্তক পড়তে পারে এবং সঠিকভাবে পবিত্র ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে পারে, এটি প্রধানত ছিল পুরোহিততন্ত্র, যদিও তার মধ্যে ছিল ভাষ্য, বিতর্ক, যুক্তিবিচার এবং উচ্চারণভঙ্গি, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্বসহ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ রক্ষা করার যাবতীয় জটিল নীতি ও পদ্ধতিসমূহ। তবে এই স্তরের শিক্ষা যে সবসময়েই আস্তিক হবে এমন কথা নেই, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে চলা হয়। এই পর্বেই অনুমান-নির্ভর দর্শনের আবির্ভাব। এই পর্বটিকে Sophia বলে চিহ্নিত করা যাক। আমি এই গ্রীক শব্দটি ধার করছি এবং যথেষ্ট নিয়মবহির্ভূতভাবে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করছি। শব্দটির অর্থ প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা হয়তো বই পড়া থেকে আসতে পারে, কেউ কেউ দাবি করেন এটি ঈশ্বর-প্রদত্ত, তবে সাধারণত প্রজ্ঞা আসে মানুষের গভীরতম চিন্তা থেকে, যে চিন্তাকে উস্‌কে দিয়েছেন শিক্ষক বা গুরু। যে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই তা হলো Sophia-র উদ্দিষ্ট হলেন ব্যক্তিমানুষ এবং তা অর্জন করা সম্ভব ব্যক্তিমানুষের দ্বারাই। এই Sophia হয়তো স্বল্পজনবোধ্য, এমনকি গুহ্য এবং সেইসঙ্গে দুর্জ্ঞেয়। এই স্তরে সমকালীন জ্ঞানান্বেষণের অনেকটাই হদিস পাওয়া যায়, যা অ-আস্তিক, ধর্মীয় আচরণবিধিরহিত কিন্তু এতটাই বিশেষায়িত যে তা গুহ্য ও দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য এবং খুবই সীমিত সংখ্যক মানুষের বোধগম্য।

শিক্ষার যে দ্বিতীয় স্তর বা মাত্রা সেই সম্পর্কে আমি গ্রীক 'Moira' শব্দটি বেছে নেব। গ্রীক চিন্তাজগতে এই শব্দটির অসীম গুরুত্ব, যদিও এক্ষেত্রেও আমি নিয়মবহির্ভূতভাবে শব্দটির অর্থ সীমাবদ্ধ রাখব। শব্দটির অর্থ হলো 'বরাদ্দকৃত ভাগ' বা 'নির্দিষ্ট অংশ' — অর্থাৎ ঈশ্বর বা ভাগ্য মানুষকে এ জগতে যেটুকু সময় ও পরিসর বরাদ্দ করেছে এ জগতে তার অবস্থান অনুযায়ী সে দায়িত্ব ও সম্পদ বরাদ্দ করে দিয়েছে। কিন্তু আমি এখানে শিক্ষাকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করব, যে শিক্ষা আমাদের সমাজ, পরিবার, বাবা-মা, প্রতিবেশীসহ গোটা জটিল সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কখনও নীরবে কখনও সোচ্চারে প্রয়োগ করা হয়। এবং সাধারণত শিক্ষার তাত্ত্বিকরা এ বিষয়টিকে অবহেলা করেন। এই ব্যবস্থায় শেখানো হয় কিছু আচরণবিধি, রীতিনীতি এবং প্রথাগতভাবে চলে আসা বিধিনিষেধ, কিছু দক্ষতা অর্জন করার পদ্ধতি, সেইসঙ্গে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, পুরস্কার, তিরস্কার, শাস্তি এরকম সামাজিক বিধি। একইসঙ্গে শেখানো হয়

কী করে এসব এড়িয়ে যেতে হয়, ঠকাতে হয়, জোচ্চুরি করতে হয়, কী করে মানুষকে ফাঁদে ফেলতে হয়, ছিনিয়ে নিতে হয়, ক্ষমতা দখল করতে হয়, পিছলে বেরিয়ে যেতে হয়, সটকে পড়তে হয়, কী করে মাতব্বরি করতে হয় ও অন্যকে দাবিয়ে রাখতে হয়। আমাদের শেখানো হয় শান্তির কৌশলও এবং আরো শেখানো হয় যে দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যে বিরতির সময়টুকুকেই বলে শান্তি। আসলে শান্তিকে কাজে লাগাতে হবে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য।

শিক্ষার তৃতীয় স্তরটির জন্য আমি কোনো গ্রীক শব্দ পাচ্ছি না, আমাকে লাতিন শব্দ Scientia ব্যবহার করতে হচ্ছে। অভিধানে Sophia এবং Scientia-র মধ্যে কোনো তফাৎ নেই এবং আমি আবার নিয়মবহির্ভূতভাবে Scientia শব্দটির সীমাবদ্ধ অর্থকে চাপিয়ে দিচ্ছি। আমি বলতে চাই যে আজ আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে শিক্ষা দিতে চাইছি সেটাই Scientia। এই শিক্ষা সুনির্দিষ্টভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক এবং এটি ধর্মনিরপেক্ষ হতে চায়, যদিও সবসময় সফল হয়েছে এমন নয়।

যদিও এক্ষেত্রে আরেকটি গ্রীক শব্দ প্রাসঙ্গিক হতে পারে। আমি বলতে চাইছি 'techne' শব্দটির কথা। গ্রীক চিন্তাজগতে এই শব্দটিরও ব্যাপক অর্থ রয়েছে। তবে আমি বলব, যে তিনটে স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি তার সবক'টিতেই এই শব্দটির একটি সংকীর্ণ অর্থ জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি স্তরেই আমাদের কিছু পরিমাণ দক্ষতা, হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা, কায়দা-কানুন রপ্ত করতে হয় — তাই এর কোনও একটার সঙ্গে এই শব্দটিতে যুৎসই বলে চালিয়ে দিতে চাই না।

শিক্ষা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক স্তরের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আরো দুটি বিষয় উল্লেখ করার আছে। এই তিনটি স্তরই একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় — বরং এই তিনটি স্তর একটি অপরটির উপর সমাপতিত হয়, প্রত্যেকটির মধ্যে সঞ্চারণ এবং স্থানান্তর হয়। এক অর্থে আমাদের Sophia-র সীমা কতটা হবে তা নির্ভর করছে আমাদের Moira ও Scientia ও উপর। আবার উল্টোটাও সত্যি যে Sophia থেকে কিছুটা প্রেরণা না পেলে, আপনি আপনার Moira ও Scientia কে ধরে রাখতে পারবেন না।

আমাদের মডেলের যে দ্বিতীয় বিষয়টি বলতে চাই সেটি প্রায়শই নজর এড়িয়ে যায়। তা হলো এই যে প্রত্যেক স্তরেই বিপরীতের মধ্যে একটি স্বতঃপরিবর্তনশীল, দ্বান্দিক ঐক্য আছে। যখন কাউকে কিছু শেখানো হয়, তখন তার মানে এই নয় যে যিনি শিখছেন তিনি সবকিছুই গ্রহণ করবেন। বর্তমানে মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং শিশুশিক্ষার তাত্ত্বিকরাও স্বীকার করছেন যে একটি শিশু শিক্ষাপ্রক্রিয়ার নিস্ক্রিয় গ্রাহকমাত্র নয়। মানুষের ইন্দ্রিয়চেতনার মাধ্যমে বোধ গড়ে ওঠা কিম্বা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে সে গ্রাহক হিসাবে সবকিছুই গ্রহণ করে এমনটা নয়। বহু-ধ্বনি, বহু-বর্ণ, বহু শব্দ বিশিষ্ট বস্তুসমষ্টির মধ্য থেকে গ্রহণ, বর্জন, বাছাই, নতুন করে ঢেলে সাজানো, কাঠামোর অদলবদল চলতেই থাকে। সেই সঙ্গে যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা থেকে যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না সেটাও উঠে আসে এবং যা শেখানোর লক্ষ্য ছিল না এমন অনেক প্রশ্নও তৈরি হয়। একটা নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা হয়তো এক বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আকুতি তৈরি করল, হয়ত তা একেবারেই অন্য ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা।

আমরা সকলেই জানি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম যৌবনে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রের জন্য তৈরি এবং বিদেশী শাসকদের তৈরি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা শেখানো হত। ঐ ব্যবস্থার ও পঠনপাঠনের অপর্যাপ্ততা ও অযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করে আমি আমার সময় নষ্ট করতে চাই না। কারণ ঐ ব্যবস্থা সকলের দ্বারাই সমালোচিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু যে কথাটা সবসময় মনে রাখা হয় না যে সেই ব্যবস্থার মধ্যেই একটি বিকল্প ব্যবস্থা ও বিকল্প শিক্ষার আকাঙ্খা গড়ে উঠেছিল। এই আকুতি সঞ্চারিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে। সেইসময় সরকারীভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা'-র লক্ষ্যে অগ্রগণ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে অন্যভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সরকারী নির্দেশনামার কিছুটা বাইরে গিয়ে শিক্ষা প্রসারের জায়গা করে নেওয়ার। এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম মনে আসে তাঁরা হলেন একটা পর্যায়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আরেকটি পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজী।

আমার চোখে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে এক বিকল্প শিক্ষাপদ্ধতির প্রবক্তা। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গণশিক্ষার দিকে এবং এক্ষেত্রে তিনি ধর্মতত্ত্ব বা অনুমাননির্ভর দর্শনের কথা বলেননি, তিনি Sophia -র উপর জোর দেননি। ১৮৯৪-১৮৯৭ সময়কালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনি একনাগাড়ে শিষ্য ও সহযোগীদের সামনে এক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলছেন। তিনি একটা প্রচার গড়ে তুলতে চাইছিলেন যাতে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রকে পড়ানো নয় বরং শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়া হোক সেই জায়গায় যেখানে মানুষ

থাকে, কাজ করে। তিনি চাইছিলেন একদল শক্তসমর্থ, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ যুবককে যাঁরা ম্যাপ, গ্লোব, ক্যামেরা নিয়ে মাঠেঘাটে কৃষকদের কাছে যাবে। প্রথমদিকে তিনি একদল সন্ন্যাসীর কথা ভেবেছিলেন যাঁরা এই কাজটাকে তাঁদেরই কর্তব্য হিসাবে নেবেন। সে যুগে এই চিন্তাই স্বাভাবিক ও বাস্তবোচিত ছিল। এখানে সন্ন্যাসী ছাড়া কেই বা এগিয়ে আসত? কারণ তিনি তো যুবসমাজকে আয়াস ও আরামের প্রচলিত জীবন ছেড়ে সেই সময়কার সমাজের বাইরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেইসময়ে এই যুবক সন্ন্যাসী ছাড়া আর কীই বা হতে পারে? তবে কিছুদিন পরে তিনি আর এ দাবি করেননি তাঁর একদল যুবককে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসী হতেই হবে। যা দরকার তা হলো দৃঢ়সংকল্প, সাহস, পরিশ্রমী ও ধারাবাহিক কাজ করার ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে চলাফেরা করার শক্তি।

এইসব নগ্নপদ শিক্ষকদের তিনি যা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি 'ক্যামেরা' নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এক্ষেত্রে একটা ধন্দ জাগে। সম্ভবত তাঁর মাথায় ছিল ফটো দেখার এক ধরণের যন্ত্রবিশেষ যা 'ম্যাজিক-লণ্ঠন' নামেই পরিচিত। এইসব জিনিস তিনি নিয়ে যেতে বলেছিলেন কেন? আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর একটাই। তা হলো তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণ তাদের চারপাশের বৃহত্তর জগৎ সম্পর্কে সচেতন হোক, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা নীচ, সংকীর্ণ জীবনের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসুক।

এই যে শিক্ষাকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে — যেহেতু পর্বত মহম্মদের কাছে আসবে না, তাই মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে — এই ধারণা তৎকালীন শিক্ষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তখনকার তত্ত্ব ছিল এই যে বাছাই করা অল্পসংখ্যক, সুবিধাপ্রাপ্ত, প্রতিষ্ঠিত মানুষদের শিক্ষিত করলে তা কিছুটা 'চুঁইয়ে' পড়বে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিবেকানন্দ অত্যন্ত তীব্রভাবে এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সচেতন হয়েছিলেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সমাজে ওপরতলাটির মুষ্টিমেয় মানুষ ও নীচুতলার জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিভেদ রয়েছে এবং বিদেশী শাসকদের মদতে তা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। তিনি প্রকৃত ভারতকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন; তিনি এই উপমহাদেশের বহু দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটেছিলেন। তিনি দেশের নিঃস্ব রিক্ত মানুষদের দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন — এযুগে ফ্রান্জ ক্যানন যাঁদের " The wretched of the Earth" বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী। বিদ্রোহ হতে হবে বহু স্বরবিশিষ্ট, বহুমুখী এবং বহুস্তরীয়। বিবেকানন্দ, বস্তুতপক্ষে তার সবগুলিকেই স্পর্শ করেছিলেন এবং তার মধ্যে কয়েকটির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাষা জুগিয়েছিলেন।

আমি বলেছি যে বিবেকানন্দ বিদ্রোহের প্রতিটি স্তরকে স্পর্শ করেছিলেন। এখন আমি বলতে চাই শিক্ষার যে তিনটি স্তরের কথা ভাবার চেষ্টা করেছি, বিবেকানন্দ তার সবগুলিই স্পর্শ করেছিলেন।

Sophia -স্তরে তিনি যা করেছিলেন অর্থাৎ ধর্মীয় প্রজ্ঞা, তা নিয়ে কথা বলা আমার সাজে না। তিনি ছিলেন একজন 'গুরু', তাঁর শিষ্যরাই এ বিষয়ে বলতে পারবেন। Sophia -র মধ্যেই রয়েছে মানুষের মনে প্রশ্ন করার আকুতি জাগিয়ে তুলতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি বিবেকানন্দ সেইটাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, যে কোন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস যা মানুষের জীবনে চেপে বসে থেকে যন্ত্রণা আর শোষণকে বৈধতা দেয়, বিবেকানন্দ তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। বহু রীতি ও আচারবিচার যা অলঙঘনীয় বলে মনে করা হতো, তার বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা বিবেকানন্দ করেছিলেন — তা সত্যিই ভোলার নয়। এর থেকে যে স্তরে আমরা উন্নীত হই তা হলো Moira- যা এক সামাজিক জীবনের স্বপ্ন দেখায় এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে শেখায়। তিনি এমন কিছু মূল্যবোধ ও আচরণপদ্ধতির কথা প্রচার করেছিলেন যা সেইযুগের এবং এই যুগেরও প্রচলিত ধারণার বিরোধী।

কিন্তু সম্ভবত তাঁর সব থেকে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর শোনা গেছে Scientia বা ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে। তিনি Scientia-র জন্য গণভিত্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাক্ষরতা এবং প্রত্যক্ষ জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান এই শক্তিতে গোটা দেশকে বদল করা সম্ভব বলে বিবেকানন্দ মনে করতেন। এই Scientia উন্নীত হবে Moira তে।

১৮৯৪-৯৭ সময়কালের পর্বে এই স্তরটি নিয়ে বিবেকানন্দ সক্রিয়ভাবে ভেবেছিলেন বলে যদি আমরা ধরে নিই, তাহলে সেই থেকে নব্বই বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়কালে আমরা কী করেছি? এই নব্বই বছরে আমরা কোন্ সাফল্য অর্জন করেছি? উত্তরটা সকলেরই জানা। শিক্ষামন্ত্রক থেকে 'Challenge of Education' শীর্ষক যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ ও বন্টন করা হয়েছে এবং আজকের অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে সকলেই স্বীকার করছেন যে সেই অবস্থাটি হতাশাব্যঞ্জক। যদি ১৮৯৪ সালে সাক্ষরতার হার কমবেশি ১০ শতাংশ ছিল, তবে তা এখন ৩০ শতাংশ। এটাকে হয়তো কিছু

অগ্রগতি হিসাবে বলা যেতে পারে। কারণ তিরিশ তো দশের তিনগুণ। ১৯৬৫ সালে জে পি নায়েক বলেছিলেন, ''গত ১৬ বছরে যা হয়েছে তা হলো নিছকই পুরোনো ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ যেখানে উপাদান ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সামান্যই হয়েছে।'' ১৯৬৬ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বলছে, ''সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা একটা ব্যবস্থাকে অনেকটা সম্প্রসারিত করেছি, যে ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত সেটাই যেটা তৈরি হয়েছিল একশ বছর আগে।'' ১৯৭১ সালে 'এশিয়ান ড্রামা' বইতে গুনার মিরদাল উদ্ধৃত করেছিলেন জে পি নায়েককে। এবং এই ১৯৮৮ সালে, আমার মনে হয়, জে পি নায়েককে আবার উদ্ধৃত করতে হবে শুধু 'ষোল বছর'-এর জায়গায় 'তিরিশ বছর' কথাটি বসাতে হবে। মূল কাঠামোটি একই আছে। সেই কাঠামো হলো গণ নিরক্ষরতার এবং ব্যাপক বৈষম্যের — পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য, শহর ও গ্রামের মধ্যে, জাতপাতের মধ্যে, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য। এই ব্যবস্থা সহ্য করবে এমন কোনও নতুন উপাদান অথবা নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি দিয়ে এই কাঠামোর পরিবর্তন আমরা করতে পারব না। এমনকি সাক্ষর-নিরক্ষরের এই অনুপাত ৩০:৭০ থেকে পাল্টে ৭০:৩০ করতে কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, যা বর্তমান ব্যবস্থা দিতেও পারবে না, সহ্যও করবে না।

সেই গুনার মিরদালকে আবার উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, ''দক্ষিণ এশিয়ার বড়ো এবং গরিব দেশগুলিতে যে বিশেষ বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্য গোটা জনসংখ্যাকে যত দ্রুত সম্ভব সাক্ষর করতে ব্যাপক উদ্যোগ দরকার। এবং এজন্য সাক্ষরতার অভিযানকে একটা 'আন্দোলনে'র এবং 'প্রচার'-এর চরিত্র দিতে হবে।''

একটা আন্দোলন ও প্রচার কখনোই টিকে থাকতে পারে না, যদি না একদল নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ়সংকল্প যুবক থাকে, যাদের কষ্ট সহ্য করার সাহস ও ক্ষমতা আছে। এইসব যুবকদের কখনও 'বৈষয়িক উৎসাহ' বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কাছে টেনে আনা û±Éõ ò±¼ÛõþæòÉõõßÂÕþÕ±úÇ– Îû Õ±úÇSophia-র দ্বারা অনুপ্রাণিত। এবং এক্ষেত্রে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই যে এ বিষয়ে দেশে এখন একটা আদর্শগত শূণ্যতা চলছে। নবোদ্যোগী পুঁজিবাদ, যা নতুন সরকারী শিক্ষানীতির পিছনে কাজ করছে বলে বোঝা যাচ্ছে অথবা সংসদীয় বিরোধীপক্ষ, যারা এই নীতির সমালোচক কিন্তু উন্নত কিছুই দেওয়ার নেই, তাদের পক্ষে এই ধরনের আন্দোলন ও প্রচারকে সংগঠিত করা ও ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। এবং যে কোনও ক্ষেত্রেই কথায় ও কাজে বিরাট ফারাক থেকে যায়। আমাদের সামনে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে যে কোনও আদর্শগত ঘোষণাই মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বড়ো বড়ো বিবৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সবসময়ই ব্যর্থতা এবং গালভরা বুলি ও তারপর বিশ্বাসঘাতকতা। গালভরা-বুলি আওড়ানোর লোক আমাদের পাশে অনেক আছেন কিন্তু মানুষ তাঁদের বিশ্বাস করে না।

তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের করণীয়টা কী ? আমরা আজ এখানে ও অন্যত্র যদি নিছক বুলি না আওড়াই, তবে কি আমরা একদল যুবক-যুবতীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, যারা মহম্মদকে পর্বতের কাছে নিয়ে যাবে ? যা আমি দেখতে পাই এবং শুনি, স্বামীজীর নির্দেশ কার্যকর করতে রামকৃষ্ণ মিশন সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। কিন্তু মিশনের নেতৃবৃন্দ সম্ভবত সর্বপ্রথম নিজেরাই স্বীকার করবেন যে মিশন এ যাবৎ যা করেছে এবং মিশন একা যা করতে পারে তা যথেষ্ট নয়। অবশ্যই আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ, আরো ব্যাপক আন্দোলন দরকার যেখানে বহু মুখ থাকবে, বহু স্বর থাকবে কিন্তু কাজে হবে ঐক্যবদ্ধ। এমনটা মনে করার কারণ নেই যে অংশগ্রহণকারীদের সর্ববিষয়ে একমত হতে হবে। যে কোনও ধরনের সংকীর্ণতা শুধু বাধা সৃষ্টি করে। তবে এই একটি ক্ষেত্রে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য ও অভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

আমি একটা দীর্ঘ ভাষণ দিলাম। ভাষণ দিতে দিতেই ভাবছিলাম, বিবেকানন্দ আজ যদি এখানে থাকতেন তাহলে তিনি কী বলতেন। একসময়ে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন, হয়তো তাতে স্নেহ থাকত এবং নিশ্চিতভাবেই ধমক থাকত। পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে তিনি হয়তো মুচকি হাসতেন এবং সবশেষে আমার পিঠে মোক্ষম এক চাপড় মেরে বলতেন, ''বেশ, অনেক তো বলেছ। এখন তুমি যা ভেবেছ তার কিছুটা করে দেখাও দেখি।'' এবং তখন নিজেকে আমার ছোট মনে হত, আমার মাথা নীচু হয়ে যেত এবং মঞ্চ ছেড়ে নেমে চলে যেতাম, ঠিক এখন যেমন চলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ।

পুনর্মুদ্রিত

অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ইংরেজীতে ভাষণটি দিয়েছিলেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের প্রেক্ষাগৃহে ১৯৮৮ সালের ১১ জানুয়ারী। ভাষণটির বাংলা অনুবাদ করেছেন **সুকান্ত মুখোপাধ্যায়,** সামান্য পরিমার্জন করেছেন অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। রচনাটি ২০১২ সালে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

উপেক্ষিত স্বাধীনতার বীর সেনানীরা — উপেক্ষা জাতিগত না স্বেচ্ছাকৃত

মনামী বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তর পেরিয়েছে স্বাধীনতার। বুড়িই বলা যায়। আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে স্মৃতিভ্রংশও। দেখা যাচ্ছে, তাকে জন্ম দিতে প্রাণপাত করা অনেক ছেলেমেয়েকেই ভুলে গিয়েছে এই বুড়ি স্বাধীনতা। সময় পেরিয়েছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝাপসা হয়েছে এক একটা মুখ। স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখে হাতে অস্ত্র তুলেছিল যারা।

কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে শ্রীশ ওরফে হাবু মিত্তির। আদতে আমতার ছেলে হাবু থাকতেন কলকাতায়, মলঙ্গা লেনে। রডা অস্ত্রলুণ্ঠনের প্রধান কুশীলব হাবু নিজেও নিখোঁজ হয়ে যান ভারত-তিব্বত সীমান্তে। কী হয়েছিল তাঁর? হিংস্র জন্তুর হানা নাকি সীমান্তরক্ষীর বুলেট? জবাব মেলেনি আজও। জবাব খোঁজার চেষ্টাও করেনি স্বাধীন ভারতের সরকার। তাই যে ৫০টি মাউজার পিস্তল ও গুলিবারুদ লুঠ এক সময় ব্রিটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে মাউজার পিস্তলের ভরসায় বুড়িবালামের তীরে ইংরেজ পুলিশবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বাঘা যতীনরা, স্বাধীনতা যজ্ঞের সেই অস্ত্র লুঠ আহুতির প্রধান সৈনিক হাবু মিত্তিরের একটা ছবিও মেলে না। স্বাধীনতার পরেও কিছুদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বৃদ্ধ বিপ্লবীদের স্মৃতিতে। আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

দুকড়িবালা দেবী। নামটা শুনেছেন? পরাধীন ভারতে অস্ত্র আইনে প্রথম দন্ডিত মহিলা। লুকিয়ে রেখেছিলেন রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের সাতটি পিস্তল ও বহু কার্তুজ। পুলিশি তল্লাশির পর জেল হয় ২ বছর। কোলের শিশু বাড়িতে রেখে জেল খাটতে যান বীরভূমের গ্রামের বউ দুকড়িবালা। সালটা ভাবুন। ১৯১৭। মারা যান ১৯৭০ সালে। এতদিন যে বেঁচে ছিলেন স্বাধীন ভারত জানতেই পারেনি।

বিপ্লবীরা নিজেরাই সতর্ক থাকতেন, তাঁদের পরিচয় যাতে অন্য কেউ না জানে। এমনকী সহ বিপ্লবীদের ক্ষেত্রেও অনেকে বজায় রাখতেন এই সতর্কতা। এমনই একজন অমৃতলাল হাজরা। ঢাকা অনুশীলন সমিতির এই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সহচরদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন কালীপদ বা শশাঙ্ক নামে। রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সম্পর্ক রক্ষায় তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা তৈরিতে দক্ষ এই বিপ্লবীকে ধরতে একটা সময় হন্যে হয়ে উঠেছিল পুলিশ। রাজাবাজার থেকে তিনি গ্রেফতার হন, শুরু হয় বিখ্যাত রাজাবাজার বোমার মামলা। দ্বীপান্তর খেটে দেশে ফিরে আসার পরেও বারবার গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ব্রিটিশ শাসকের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া এই বিপ্লবী সাধারণের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে যান তাঁর জীবদ্দশাতেই। কিছু পুরনো বইয়ের পাতায় এখন শুধু বেঁচে আছেন অমৃতলাল হাজরা।

কানাইলাল ভট্টাচার্য। নিজেই চেয়েছিলেন তাঁর নামটা যেন জানাজানি না হয়। আদালতে ঢুকে গুলি করে খুন করেন দীনেশ গুপ্তকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া বিচারপতি গার্লিককে। গার্লিকের দেহরক্ষীর জবাবি গুলিতে শহিদ হন তিনি নিজেও। পকেট থেকে যে চিরকুট পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল বিমল দাশগুপ্তের নাম। বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত তখন ফেরার, মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডিকে খুনের অভিযোগে তাঁকে খুঁজছে পুলিশ। সেই সময় এগিয়ে আসেন কানাইলাল, সহ বিপ্লবীকে বাঁচানোর জন্য তাঁর দায় এভাবেই নিজের কাঁধে নেন তিনি। গার্লিক হত্যাকারীর আসল পরিচয় দীর্ঘদিন জানতে পারেনি পুলিশ। তাঁর মাও জানতেন না, ছেলে মারা গিয়েছে। নিজের পরিচয়কে

পুরোপুরি লুপ্ত করে দিয়ে সতীর্থকে বাঁচানোর চেষ্টা করা এই বিপ্লবীকে কতটুকু মনে রেখেছে বাঙালি?

পুরনো বইয়ের ঝুরঝুরে পাতা ওল্টালে এভাবেই সরে সরে যায় একটার পর একটা নাম, মুখের সারি। বসন্ত বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, অসিত ভট্টাচার্য। রণেন গাঙ্গুলী ও চারু বসু, সেই দুই বিপ্লবী, প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেওয়া নন্দলাল ব্যানার্জিকে যাঁরা গুলি করে মেরেছিলেন। একটা হাত অকেজো ছিল চারুবাবুর। সেই হাতে পিস্তল বেঁধে অন্য হাতে ট্রিগার টেপেন। মালখাঁনগরের মানকুমার বসু, পেশায় সৈনিক মানকুমার সাবমেরিনে করে অস্ত্র নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মাদ্রাজ, ব্রিটিশরা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায় তাঁকে। কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন এঁরা, কেউ মনে রাখেনি। না সরকার, না দেশবাসী, না ইতিহাস বইয়ের পাতা। আন্দামানের দ্বীপান্তরে বছরের পর বছর নিঃশেষ হওয়া অসংখ্য বিপ্লবী মুখ, এঁরা বেশিরভাগই লেখাপড়া শেষ করেননি, স্কুল কলেজে পড়াকালীনই আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। স্বাধীন দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, চূড়ান্ত আর্থিক অনটন ও অবহেলায় জীবন কেটেছে। ননীবালা দেবী যেমন। ইংরেজ অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল তাঁর ওপর, জেলে। বেরিয়ে এসে দেখেন, মাথার ওপর ছাদটুকুও নেই। শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন বাগবাজারে, ভাড়া বাড়িতে, সুতো কেটে, রান্নার কাজ করে, অর্ধাশনে। কজন জানতেন, এই মহিলাই আলিপুর জেলের গোয়েন্দা দফতরের স্পেশাল অফিসার গোল্ডির গালে চড় মেরেছিলেন, বা মোহিত মৈত্র। সেলুলার জেলে অনশনে বসেছিলেন। জোর করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে তাঁর ফুসফুসে দুধ ঢুকিয়ে দেয় ব্রিটিশ পুলিশ। নিউমোনিয়া হয় মোহিতের। সেই অবস্থাতেও গান গাইতেন। মৃত্যুর আগে চিকিৎসক অনুরোধ করেন, অন্তত ওষুধটুকু খেতে। বরাবরের হাসিখুশি মোহিত উত্তর দেন, অই অ্যাম স্টিল অন হাঙ্গার স্ট্রাইক। হরিপদ ভট্টাচার্য, চট্টগ্রামের কুখ্যাত পুলিশ অফিসার আসানুল্লাকে গুলি করেন যিনি। টোলের ছাত্র, হতদরিদ্র ঘরের ছেলে হরিপদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পুলিশ, রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ১৬ বছরের ছেলেটির ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন করা হত। তবু তার মধ্যেই হরিপদ চিৎকার করে বলতেন, মাস্টারদা সূর্য সেন জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘদিন ছিলেন আন্দামানে, জেলে কাটান মোট সতেরো বছর। ফিরে আসার পর বিয়ে করেছিলেন, সংসার চলত স্ত্রীর সামান্য রোজগার ও বিপ্লবীদের সরকারী ভাতায়। মারা যান ১৯৯৩-এ ক্যান্সারে, চিকিৎসার জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, খবরটুকুও নেয়নি।

অদ্ভুত এই বিস্মরণই হয়তো আমাদের দিয়ে গাইয়ে নেয়, দে দি হামে আজাদি বিনা খড়্গ, বিনা ঢাল / সবরমতী কে সন্ত তুনে কর দিয়া কামাল। জাগৃতি ছবির গান, প্রতি বছর নিয়ম করে গাওয়া হত মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, এখনও হয় হয়তো। কিছু পরের লাইন আরও সাংঘাতিক, চুটকি মে দুশমন কো দিয়া দেশ সে নিকাল। ১৯৫৪-য় মুক্তি পায় এই ছবি, নেহেরু জমানা কিন্তু দেশের জন্য রক্ত ঝরানো বিপ্লবীরা অনেকেই তখনও বেঁচে। তাঁদের সামনে এত বড় নির্লজ্জ মিথ্যে প্রচার করতে একবারও দ্বিধা হল না? অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, প্রবর্ত্তক সংঘ, এত স্বাধীনতা সংগ্রামীর এত রক্ত, যন্ত্রণা সব মুছে দিয়ে শুধু সত্যি হয়ে রইল কিনা আজাদি এসেছে বিনা খড়্গ, বিনা ঢালে, অহিংস পদ্ধতিতে। তাও আবার চুটকিতে! গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস মিথ্যে, নোয়াখালি মিথ্যে, ৪৭-এর দেশভাগ, রক্তস্নান সব মিথ্যে। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। ছবির পরিচালক বাঙালি, নাম সত্যেন বোস। প্রযোজকও তাই, শশধর মুখার্জী। সুরকার হেমন্ত মুখার্জী, তখন বলা হত হেমন্ত কুমার। আর অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য। এতজন বাঙালি এত বড় পুকুরচুরি মেনে নিলেন কোন যুক্তিতে?

শুধু সিনেমাই নয়, স্কুল কলেজের ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকেও সন্তর্পণে মুছে ফেলা হয়েছে এই বাঙালি বিপ্লবীদের। মুছে ফেলা ভুল, বলা ভাল, তাঁরা কখনও উল্লিখিতই হননি। যে খন্ডিত ইতিহাস আমরা পড়ে থাকি, তাতে সহিংস বিপ্লব যে কতটুকু জায়গা পেয়েছে তা কারও অজানা নয়। আমাদের ইতিহাস বিস্মৃত তো বটেই, একইসঙ্গে বিকৃত। আর কয়েকটা প্রজন্ম এভাবে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে আমরাই বা কী পেলাম? যে বাঙালি ১৯০৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ জায়গায়, ইংরেজও ভয় পায় যাকে, সেই আবার ১৯৪৭-এ দিশেহারা, কোনওক্রমে দেশভাগ করে প্রাণটুকু শুধু বাঁচাতে চাইছে। তার দিন কাটছে উদ্বাস্তু হয়ে, সম্মান, সম্পত্তি সব খুইয়ে, শিয়ালদহ স্টেশন বা ত্রাণ শিবিরে মাথা গুঁজে। মাত্র ৪০-৪২ বছরে এত বড় পরিবর্তন। এখন মনে হয়, যদি সেই যুবক যুবতীরা সেদিন ওইভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে না পড়তেন, যদি সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথ বেছে নিতেন, তাহলে হয়তো আজ বাঙালির সমাজজীবনে যে অদ্ভুত শূণ্যতা, তা তৈরি হত না। ইতিহাস অন্যরকম হত।

উপনিবেশের চোখ

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৯৫ সালে প্রকাশিত এক শিক্ষিত বাঙালীর লেখা বইতে চোখ বোলাতে বোলাতে ক্রমশ এক অন্যরকম 'দেখা'র সঙ্গে পরিচয় ঘটতে শুরু করল। কৃষ্ণনগর কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে সপরিবারে দার্জিলিঙ্ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে যে দার্জিলিঙ্ ধরা পড়েছিল, সেকথা তিনি শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্তীকে পত্রাকারে লিখে জানান। এই সকল পত্র পরবর্তী সময়ে 'দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। শতাব্দীকালেরও অধিক পূর্বের দার্জিলিঙ্ কেমন ছিল, এ শুধু তাই আমাদের সামনে তুলে ধরেনি বরং তার চেয়েও যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তা হল, একশো বছর আগের বাঙালীর 'অপর'কে দেখার ধরনটি কেমন ছিল — তা আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

তারাপদবাবু যে দার্জিলিঙের কথা লিখেছেন তা কেবল দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ নয়। দার্জিলিঙের বাজার, হাট, সাহেবদের জীবনযাত্রা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চা-বাগান এ সমস্ত কিছু তার বর্ণনায় উঠে এসেছে। কিন্তু তার বিবরণের যে দিকটা আমাদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তা হল দার্জিলিঙের জনজাতিদের কথা। 'দার্জিলিঙ্গের অধিবাসী' শীর্ষক অংশে এদের কথা তিনি বলেছেন। এদের তিনি 'আদিম অধিবাসী' বলেছেন, আদিবাসী নয়। আদিবাসী শব্দটি যে তখন প্রচলিত ব্যবহারে উঠে আসেনি, তা বোঝা যায়। 'আদিম অধিবাসী' হিসেবে তিনি নেপালী, ভুটিয়া, লেপ্চা, কোচ, মেচ এবং ঢিমাল (এই বানান তিনি রেখেছেন, বর্তমানে ঠিমাল বানানটি প্রচলিত)। ইতিমধ্যে তারাপদবাবু ভুটিয়াবস্তিতে ঘুরে এসেছে, মূলত তাদের 'বুদ্ধ-মন্দির' দর্শনের অভিপ্রায়ে। এখানে তার আলোচনায় ভক্তি ভাব যতটা না প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়েও বেশি জাত্যাভিমান ও 'উচ্চসংস্কৃতির' গরিমার আভাস অনেক স্পষ্ট। মহাকাল বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবতা তার উল্লেখে মহাদেব। লামা যে বিশেষ কিছু জানেন না এই তার অভিমত; বরং লামার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বার হচ্ছে, প্রথাগত ভাবে পৌরহিত্যের অধিকারী ব্রাহ্মণ সন্তানের তা নজর কেড়েছে অনেক বেশী। পরবর্তী সময়ে যা আরও স্পষ্ট হয়েছে ভুটিয়াদের সম্পর্কে হীনতাসূচক জাত্যাভিমানী শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ দিলে বোধ হয় ভাল হবে।

"ভুটিয়ারা প্রায়ই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু বুদ্ধের বিমল ধর্ম্ম অজ্ঞান ও অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে পড়িয়া নানারূপ কুসংস্কারে জড়িত হইয়াছে। .... ভুটিয়াগণ কুৎসিত উপদেবতার ও ভূত-প্রেতাদির পূজা করে, এবং অতি কদর্য্য স্থানে বাস করে। ..... ইহারা স্বভাবতঃ উগ্র, অত্যন্ত মাংসাশী ও মদিরা-প্রিয়। .....সার্পা ভুটিয়াগণ নিতান্ত অসভ্য, দেখিতে ভয়ঙ্কর ও একগুঁয়ো"।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুরানো দার্জিলিংয়ের ছবি

কিভাবে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভুটিয়াদের সম্পর্কে এমনতর ধ্যান ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু 'অপর'কে দেখার একটি প্রকাশ্য বয়ান আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। উপনিবেশিক ভারতে সাহেবের চোখ আর শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি যেন মিলেমিশে যায়। সাহেবদের বিবরনীতেও আমরা যথেচ্ছ ভাবে 'বাঁদর সদৃশ', 'কুৎসিত', 'অসভ্য' ইত্যাদি শব্দ জনজাতিদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আর, সাহেবী ধারায় শিক্ষিত বাঙালীর মগজ ধোলাই যে ভালোরকম হয়েছিল তারাপদবাবুর লেখনী তার জ্বাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বহন করে।

আসলে সেই সময়ে সভ্য-অসভ্য একটি স্তরক্রম তুলে ধরা হত। এর মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক শাসন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার

যৌক্তিক সমর্থনকে দৃঢ়তর করতে চেয়েছিল। কেননা 'অসভ্য'দের সভ্য করার মহান ব্রত সামনে না থাকলে কেনই বা তারা এদেশে পড়ে আছেন। তারাপদবাবু লেখাও এর ব্যতিক্রম নয়; কেন না এখানেই তিনি লিখেছেন —

"ইংরেজ মহোদয়গণের অনুগ্রহে ভুটিয়াগণ এক্ষণে সভ্যতা - সোপানে পদার্পণ করিতেছে ; ....."

ক্ষমতাবানের 'অপর'দের প্রতি এই দৃষ্টি কী কেবল ঔপনিবেশের অবদান বলে মনে করবো ; না কি আধিপত্যবাদের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করবো তা ভেবে দেখার। প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণ বর্ণ স্থানীয় মানুষদের যেভাবে দেখা হত ; যে ভাষায় তাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তা কি 'ঔপনিবেশের - চোখ' এর থেকে খুব ভিন্নতর ছিল। আসলে 'ঔপনিবেশের - চোখ' যা তা 'ক্ষমতার চোখ' এর থেকে আলাদা কিছু নয়। সেই 'ক্ষমতা' সবসময় এক 'অপর'কে নির্মাণ করে চলে — যার উপর সে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আসলে যে কোন জ্ঞানকান্ডই আমাদের সমকালীন অবস্থাগতিকের সৃষ্ট প্রকল্প। আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ রাজনৈতিক ভাষ্য সবই এরই উপর দাঁড়িয়ে থাকে। উপনিবেশের চোখ তাই কোন একটি কালের গন্ডীতে বাঁধা থাকে না। এরই প্রবর্ধিত অংশটিকে সম্বল করে রাজনীতি তার ডালপালা মেলে। জাতিগত বিদ্বেষ, সম্প্রদায়গত হানাহানি এসবই প্রহোৎসাহিত হয় এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা এর বাইরে কথা বলতে পেরেছেন — একজন বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য কিংবা রবীন্দ্রনাথ, তারা যুগপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য কাছে পৌঁছতে আমরা তো বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছি। 'দেখা' তো আসলে 'দর্শন' — কোন ভাবে কি সেই বোধে উপনীত হতে আমরা আটকে যাচ্ছি।

এই প্রশ্নটি থেকেই 'সভ্য-অসভ্য' বর্গীকরণের এক নতুন অধ্যায় রচনা শুরু হতে পারে। মানবিকতা বোধের মানদন্ডে সভ্যতার মূল্যায়ন করা জরুরি। বস্তুগত জাতিগণনায় যে উন্নয়নের হিসেব নিকেশ আমরা করতে চাইছি, তা ক্রমশ যে অর্থহীন হয়ে পড়ছে তা কেউ কেউ একটু বেশি করে বুঝতে পারছি আজকাল। 'উপনিবেশের চোখ' আদতে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে ; পুনরায় তা নিমীলিত হওয়ার আগে জাগ্রত থাকতে হবে। ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস অর্জন করা কম কথা নয়।

হাঁচির জারিজুরি

মালতী দাস

হ্যাঁচ্ছো ? হ্যাঁচ্ছো ঃ যাচ্ছি শুধু হেঁচে
হাঁচির চোটে সমস্ত কাজ গেল বুঝি কেঁচে।
হাঁচির শব্দে ছোট্ট খোকা আঁৎকে উঠে কাঁদে
হাঁচির শব্দে রাঁধুনির রান্নাতে গোল বাঁধে।
হাঁচির শব্দে টমি আমার একেবারে চুপ
হাঁচির শব্দে বিল্টু সোনা ঢক্ করে খায় সুপ।
হাঁচির শব্দে মেয়ের পড়া এক্কেবারেই বন্ধ
হাঁচির শব্দে ছোট্ট খুকির বিঘ্ন নাচের ছন্দ।
হাঁচির শব্দে ঠাকুরদাদার দাঁত গেল সব পড়ে
হাঁচির শব্দে ঠাকুরমা, হোঁচট খেয়ে মরে।
হাঁচির শব্দে বাবার চোখ, উঠল কপালে
হাঁচির শব্দে মায়ের মরণ, দেখব অকালে ?
হাঁচির শব্দে পাশের বাড়ি, ভয়েই জড়সড়
হাঁচির শব্দে ভিরমি খেয়ে, গিন্নি মরমর।
হাঁচির শব্দে কার কি হল, শুনলে সবার দশা
আমার শুধু লাভ হয়েছে কামড়ায় নি মশা।

রঙ্গ-রসিকতায় বারো খ্যাতনামা

তাপস বাগ

ছুটছে, সবাই ছুটছে। ছেলে থেকে বুড়ো। থামার সময় নেই। রস-কষহীন হয়ে পড়ছে জীবন। অথচ হাজার ঝক্কি-ঝামেলার মাঝে মনের হাসিটাও ধরে রাখতে হবে। স্বনামধন্য মহাপুরুষেরা ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন রঙ্গ-রসিকতায় বেশ পটু। দেখে নেওয়া যাক কিংবদন্তী খ্যাতনামাদের রঙ্গ-তামাসার কিছু নিদর্শন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ

লোকে বলে প্রাতঃ স্মরণীয় বিদ্যাসাগর। সেকালে তাঁর মতো আধুনিক মানুষ ছিল বিরল। তিনি ঠাকুর দেবতার চেয়ে মানুষকেই বড় করে দেখতেন। এই মহান হৃদয় মানুষটির সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করতে এলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বিদ্যাসাগরও যথারীতি যত্ন আপ্যায়ন করলেন। আতিথেয়তায় মুগ্ধ রামকৃষ্ণদেব বলে উঠলেন, 'ওহে তুমি খানাডোবা নও, বিদ্যার সাগর। তোমাতে ডুব দিতে এলাম।' প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগরও মজা করে জবাব দিলেন, 'ডুব দিতেই যখন এসেছেন, তখন একটু নোনা জলও খেয়ে যান।'

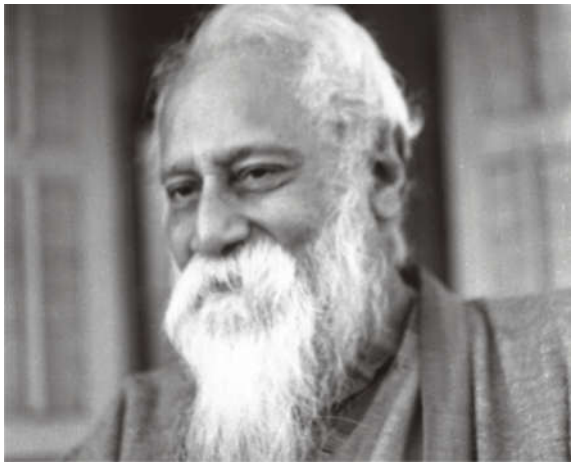

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

বেয়াই বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বেয়াই। সেখানে বসেছে রসিকজনের জমাটি আড্ডা। ঘরের বাইরে জুতো খুলে রেখেছেন সকলে। শুঁড় তোলা তালতলার চটি পরতেন বঙ্কিমচন্দ্র। দামোদরবাবু কোনোও দরকারে হঠাৎ ঘরের বাইরে এসে দেখেনে গড়িয়ে আসা খানিকটা জলে বঙ্কিমচন্দ্রের চটিটা বেশ ভিজে গেছে। ঘরে প্রবেশ করে তিনি বললেন, 'বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল।' সাহিত্য সম্রাটের তক্ষুনি জবাব, 'কোনদিকে, দামোদরমুখো বুঝি?' সভার সকলেই হেসে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

জমজমাটি আসর সেদিন শান্তিনিকেতনে। বহু গুণীজনদের মাঝে বসে রয়েছেন নেপালচন্দ্র রায়। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ খানিকটা গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'আজকাল আপনার ভুলটা বড্ড বেশি হচ্ছে নেপালবাবু। এজন্য আপনাকে দন্ড পেতে হবে। কোনোমতেই রেহাই পাওয়া যাবে না।' এ কথা বলেই রবীন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে গেলেন। নেপালবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্যরাও বেশ বিচলিত! নেপালবাবু কী এমন ভুল করলেন যে তার শাস্তি হবে? সকলেই যখন আশঙ্কার দোলাচলে, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ লাঠি হাতে ঘরেতে প্রবেশ করলেন, এগিয়ে গেলেন নেপালবাবুর দিকে। মৃদু হেসে বললেন, 'এই নিন মশাই আপনার দন্ড। কাল ভুল করে আমার ঘরে ফেলে গিয়েছিলেন।' আসরের সবাই যেন চিন্তামুক্ত হল।

মহাত্মা গান্ধী ঃ

তখন ভারত পরাধীন। মহাত্মা গান্ধী গেছেন ইংলন্ড ভ্রমণে। পরনে সেই চিরাচরিত পোষাক, হাঁটু পর্যন্ত নামা ধুতি, খালি গা। সঙ্কোচের কিছু নেই। এই পোষাকেই ব্রিটেনের রাজার সঙ্গে চা খেলেন গান্ধীজি। চা পান করে বেরোনো মাত্র গান্ধীজিকে ঘিরে ধরলেন ব্রিটিশ সাংবাদিকরা। তাদের প্রশ্ন ছিল, 'এই পোষাকে আপনি রাজার সঙ্গে দেখা করলেন?' মুচকি হেসে গান্ধীজি বললেন, 'তাতে আর কি যায় আসে, আপনাদের রাজামশাই একাই তো দু'জনের পোষাক পরে বসেছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ

এক আসরে গল্পগুজবে মশগুল মিস্টার গুডউইন, স্বামী

বিবেকানন্দ ও স্টাডি সাহেব। কথা প্রসঙ্গে গুডউইন বললেন, 'যখন দেখি কোনো মানুষ গাধাকে মারছে তখন আমি সাংঘাতিক রেগে যাই।' রসিকতা করে বিবেকানন্দ বলে উঠলেন, 'যথার্থ বলেছেন, গাধাকে মারলে আপনার স্বশ্রেণীর প্রতি প্রেম উথলে ওঠে, সে কারণেই আপনার এত রাগ হয়।' বেচারি গুডউইন লজ্জায় মুখ লোকাবার জায়গা পান না।

বিধানচন্দ্র রায় ঃ

মহান চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় রঙ্গ রসিকতায় কিছু কম ছিলেন না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় একজন মন্ত্রী ছিলেন যাদবেন্দ্র পাঁজা। কখনও তিনি জুতো পরতেন না। সেদিন ছিল মন্ত্রীপারিষদের বৈঠক। কালিপদ মুখোপাধ্যায় নামে অন্য এক মন্ত্রীকে সভায় আসতে দেখে ডাঃ বিধান রায় সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে কালীপদ তুমি তো এলে। কিন্তু খালিপদ (যাদবেন্দ্র পাঁজা) কোথায়?'

উইনস্টন চার্চিল ঃ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও নোবেল জয়ী লেখক উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে লেডি নানসি অ্যাস্টর-এর সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়। লেডি নানসি ছিলেন হাউস অব কমন্সের প্রথম মহিলা সদস্য। একবার পার্লামেন্টে জোর তর্কাতর্কির পর নানসি বলেন, 'উইনস্টন, তুমি যদি আমার স্বামী হতে তাহলে কফিতে বিষ মিশিয়ে তোমায় খাইয়ে দিতাম। ওতেই আমার শান্তি হত।' মুচকি হেসে চার্চিল বললেন, 'তুমি যদি আমার স্ত্রী হতে, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে ঐ কফি পান করতাম।'

রজনীকান্ত সেন ঃ

কবি ও গীতিকার রজনীকান্ত সেনও ভারি রসিক ছিলেন। একদিন কবি রসময় লাহা এলেন তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'ছাইভস্ম' নামক বইটি হাতে নিয়ে। রজনীকান্তকে বইটি উপহার দিলেন। রজনীবাবুও নিরাশ করলেন না। তিনি নিজের সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই 'অমৃত' রসময় লাহার হাতে দিয়ে বললেন, "ধরুন 'ছাইভস্ম' দিয়ে 'অমৃত' নিয়ে যান।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অবসরে দাবা খেলতে ভালোবাসতেন। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে চুটিয়ে দাবা খেলছেন। কিছুক্ষণ খেলা চলার পর মোক্ষম এক চাল দিয়ে তাঁর বন্ধুর নৌকাটি তুলে নিলেন। মজা করে বন্ধু বললেন, 'ভালোই করেছেন। নৌকাটা ফুটো ছিল।' এর কিছুক্ষণ পর বন্ধুটি দূরন্ত এক চালে শরৎচন্দ্রের ঘোড়াটি তুলে নিলেন। মজা করে শরৎচন্দ্র বললেন, 'আপদ বিদেয় হয়েছে, বেতো ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না।'

ভিক্টর হুগো ঃ

ফরাসি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ভিক্টর হুগো যখন 'লা মিজারেবল' প্রকাশ করলেন তখন তা নিয়ে তুমুল মাতামাতি শুরু হল। সালটা ছিল ১৮৬২। গোটা দেশ জুড়ে পত্র পত্রিকায় সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, চিঠিপত্রের এলাহি কান্ড! এদিকে বইটির বিক্রিবাটা কেমন হচ্ছে সেটা জানতে হুগো উৎসাহ বোধ করছিলেন। তাই থাকতে না পেরে একদিন প্রকাশককে চিঠি লিখে ফেললেন। চিঠিতে ছিল শুধুমাত্র একটি '?' চিহ্ন। প্রকাশকও ছিলেন বেশ রসিক। উত্তরে তিনি লিখলেন '!' চিহ্ন। অর্থাৎ বিস্ময়কর ভাবে বইটি বিক্রি হচ্ছে।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ

জনপ্রিয় রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর নেশা ছিল খেয়ালখুশিতে রাবড়ি কিনে খাওয়া। তিনি পরিচিতদের বলতেন, 'আমি রাবড়ি কুলকুচি করে ফেলে দিই। তবে বাইরে নয়, ভিতরে।'

রবি ঘোষ ঃ

শুধু পর্দায় মজার চরিত্রে অভিনয়ের সময় নয়, পর্দার বাইরেও সকলের প্রিয় অভিনেতা রবি ঘোষ ছিলেন সমান রসিক। তাঁর অনাবিল রসিকতার একটি নমুনা দেওয়া যাক। একবার চারবন্ধু মিলে ট্রামে উঠেছেন। টিকিটের দাম জানতে চাওয়ায় কন্ডাক্টর বললেন, 'পাঁচ পয়সা'। রবি ঘোষ মুচকি হেসে সকৌতুকে বললেন, 'বাঃ বেশ সস্তা তো। আপনি চারটেই দিন।'

তথ্যসূত্র ঃ ১. সুখী গৃহকোণ ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ , ২. মনীষীদের রসিকতা- শান্তা শ্রীমানী, ৩. সুখবর- রবিবারীয় ১লা জুলাই ২০১৮।

কথার লব্‌জ বা মুদ্রাদোষ

পল্টু ভট্টাচার্য্য

আজকাল আমরা আনন্দ, হতাশা, বিষাদ, উদ্বেগ, হিংসা প্রভৃতি প্রকাশ করতে কথার লব্‌জ ব্যবহার করি। আপাত দৃষ্টিতে যা মুদ্রাদোষ বলে ভ্রম হয়। তেমনিই একটি কথার লব্‌জ 'কি বলিব ভাই'।

জামাইষষ্ঠীর সাত সকালে মনমরা কুণালবাবু বাজারে বন্ধু মৃণালবাবুকে দেখে বললেন কি বলবো ভাই! সক্কালবেলায় মেয়েটা তল্পিতল্পা নিয়ে বাড়িতে হাজির। আমি বললাম হ্যারে জামাই কই? উত্তরে সে বলে ও এক নম্বর তার কাটা। আচ্ছাসে ঝাড় দিয়ে ওবাড়ি থেকে চলে এলাম। ও ঘরে আর সংসার করব না। হায় রে কুণালবাবু!

ভানুমতী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রতিভা দেবী একগাদা সাংবাদিক আর ক্যামেরার সামনে ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন। সহকর্মী কৃষ্ণাদি ছুটে এসে বললেন কি হলো? প্রতিভাদি বললেন কি বলবো ভাই এরা বলছে আমি নাকি আধ ঘন্টা আগে অঙ্কের প্রশ্নের বান্ডিল খুলে ফেলেছি ছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট হওয়ার জন্যে। সরকার নাকি আমার শুধু চাকরি নয়, ভিটে মাটি চাঁটি করে দেবে। এটাই কি আমার এতো দিনের সততার পুরস্কার? প্রতিভার কি অবমূল্যায়ন?

সুকান্তর সঙ্গে মাধবের বাস স্ট্যান্ডে দেখা। মাধবকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল কি বলবো ভাই, যে বাসন্তীর জন্যে ওর দাদার হাতে জুতো পেটা খেয়েছিলাম সেই বাসন্তী আর আমার চার হাত এক হলো বলে। একমাত্র তুই বলেছিলি, লড়ে যা কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। ওরে রমণীর মন / বিরহী কপোতপ্রায় কেন বক্ষ মাঝে করিস ক্রন্দন?

দত্তকাকু তার জার্মানবাসী ছেলেকে নিয়ে খুব গর্ব করতেন। সে নাকি নামজাদা বিজ্ঞানী। তো সে একবার গ্রামের সম্পত্তি বেচে বাবা মাকে নিয়ে জার্মান যাবে বলে ঠিক করেছে। যথা সময়ে দমদম থেকে প্লেনে চড়ে দত্তকাকুর ছেলে হাওয়া। বিমান বন্দরের পুলিশ দিন সাতেক দত্তকাকু আর কাকীমাকে দেখভাল করল। তারপর দত্তকাকুর ছেলে দমদম সেন্ট্রাল জেলে আর দত্তকাকু সস্ত্রীক গ্রামে। গ্রামবাসীরা কাগজে খবরটা জেনে দেখা করতে এলে সবাইকে বলেন কি বলবো ভাই। জার্মান গিয়ে ছেলের যে এতো উন্নতি তা কি করে বুঝবো? সত্যিই যুগের হাওয়া বটে।

বিদেশ থেকে মেয়ে জামাই আসছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুবলবাবু মানিকতলা বাজার থেকে আটশো টাকা কেজি গলদা চিংড়ি আর দু'হাজার টাকা কেজি ইলিশ মাছ কিনলেন। তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাজার করলেন। শেষমেশ মোবাইলে বউএর তাড়া খেয়ে ঘরমুখো হলেন। বাজার থেকে বেরিয়ে ব্যাগটা কিরকম হালকা লাগলো। তারপর দেখেন মাছের ব্যাগটাকে কে চক্ষুদান করেছে। পথিমধ্যে প্রতিবেশী নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা। হতাশ হয়ে বললেন - কি বলবো ভাই, পকেটমারে পকেট মারতো এখন দেখছি দামী মাছও তারা গ্যাঁড়া মারছে। হস্তলাঘব শিল্পের কি এটা উন্নয়ন?

শিবেনবাবু নাতিকে কলকাতার নামী স্কুলে ভর্তি করাবেন। ফর্মের জন্যে সারারাত স্কুলের সামনে লাইন দিয়েছেন। সঙ্গী টুপি, মাফলার, সোয়েটার, চাদর আর ইনহেলার। সকাল হতেই ফর্ম দেওয়া শুরু হলো। কোথা থেকে তিন চারটে খুনকো ছেলে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে ফর্ম তুলে নিয়ে চলে গেল। ফর্ম দেওয়া শেষ হয়ে গেল। যাবার সময় ছেলেগুলো বলে গেল এ্যাই বুড়ো এটা আমাদের রাজ। মাল দিবি ফর্ম পেয়ে যাবি। নিরুপায় হয়ে টুপি, মাফলাব, ইনহেলার রাস্তা থেকে কুড়োচ্ছেন। ওনার বয়সী এক বৃদ্ধ সাহায্যের হাত বাড়ালেন। শিবেনবাবু বললেন কি বলবো

ভাই ! এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অদ্ভুত রাজ চলছে। মালকড়ি না দিলে কিছুই শেখা যাবে না। শিক্ষা নাকি এখন সব থেকে দামী পণ্য !

নাতনীকে নিয়ে উৎপলবাবু আইনক্সে গেছেন। উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'রমণী' ছবিটা নাতনীকে দেখাবেন। ও বাবা গিয়ে দেখেন এক দল নারীবাদী মহিলা হলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। আজ নাকি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস তাই নারীকে প্রতিবন্ধী হিসাবে দেখানো চলবে না। চুলোয় গেল জীবনদর্শন। কাউন্টারে টিকিট ফেরত দিতে গিয়ে বললেন কি বলবো ভাই এযুগে গদ্য সাহিত্যের জনককেও অপমানিত হতে হয়।

তবে লব্‌জের মজা হচ্ছে সে সমাজের সর্ব্বস্তরেই বিরাজ করে। ছোটোবেলা থেকেই মধু নাপিতের সেলুনে চুল কাটি। তার লব্‌জ হলো হ্যাঁ কি না বলুন ভাই ? পাড়ায় নরসুন্দর থাকা মানেই সব খবরের সিন্দুক থাকা। একদিন বাগচীকাকু দাড়ি কাটছেন। হঠাৎ মধুদা বলল আপনার হবু জামাইটা বড়ো চোলাই টানে। হ্যাঁ কি না বলুন ভাই ? বাগচীকাকু সপাটে মধুদাকে একটা চড় মেরে বলল - শুয়োরবাচ্চা এ খবরটাও জানিস ? বলে আধ কামানো গাল নিয়ে বাগচীকাকু সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল। মধুদা কাঁদকাঁদ স্বরে বাবাকে বলল দেখলেন তো ইন্দুদা সত্যি কথা বললাম বলে ওনার রাগ হয়ে গেল। হ্যাঁ কি না বলুন ভাই ? এ যেন হঠাৎ করে ভিসুভিয়াস থেকে অগ্নুৎপাত ঘটল। বাবা আমায় নিয়ে সেলুন ত্যাগ করল।

গবাদা পাড়ার এক নম্বর সাইকেল সারানোর মিস্ত্রি। সে আবার জানি না বেশি পয়সা নেবে বলেই হয় তো কথায় কথায় বলত 'এই রে ঘটি হারিয়েছে।' সাইকেল লিক, ব্রেক টাইট, টাল ভাঙ্গা, সিট নরম করা মানে সাইকেলের যাই হোক না কেন বলতো এই রে ঘটি হারিয়েছে ? বলেই কাজে লাগতো। এই লব্‌জের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতো জানিস না ওটা আমায় কাজে এনার্জি দেয়। পাড়ার গমকলে মা পাঠাত গম ভাঙ্গাতে। মা বলতো গৌরেটা মহাচোর ওজন দেখে নিবি। তাই মার কথা মতো আমিও বলতাম গৌরদা আমার কিন্তু তিন কেজি। সঙ্গে সঙ্গে গৌরদা বলতো এই রে ঘটি হারিয়েছে ? তিন কেজি ? বুঝতাম খদ্দেরকে ভড়কি দেওয়ার জন্যে বলতো।

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না। আমাদের ক্লাবের ক্রিকেটার গোবিন্দবাবু ভাল রান করেন কিন্তু একটা লব্‌জের জন্যে দল হেরে যায়। বল মেরেই লব্‌জটা বলতেন - আমি কি কোন ট্রাবল দিচ্ছি আর ওদিকের ব্যাটসম্যান বার বার এগিয়ে এসে রান আউট হতো। গোবিন্দ যথারীতি ক্রীজে দাঁড়িয়ে থাকতো। বিরক্ত হয়ে ক্যাপ্টেন মেজজ্যাঠা বলল বাবা গোবিন্দ ননীচোরা মাধব, দয়া করে চারদিকে তাকিয়ে দেখো তারপর হাঁক পেড়ো। গোবিন্দ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে বললেন মেজদা আমি কি কোন ট্রাবল দিচ্ছি। ভবী ভোলবার নয়।

আমাদের আকেলা ছিল ফুটবল টিমের ম্যানেজার। সে আবার লব্‌জের সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমও করত। মাঠের মধ্যে প্লেয়ার বাজে খেলছে আর আকেলা মাঠের বাইরে ছুটছে আর প্লেয়ারকে বলছে মারব মুখে জুতোর বাড়ি। এমনই একদিন তালতলা মাঠে খেলা হচ্ছে। প্লেয়ারটা বল পেয়ে পা চালাতে ভুল করল কিন্তু আকেলা ভুল করে নি। মাঠের পাশে বসা ঝাল মুড়ির টিনে এক লাথি আর মুখে লব্‌জ - মারব মুখে জুতোর বাড়ি। বাস্ যতো ঝালমুড়ি আর জলওয়ালা ছিল তারা চিৎকার জুড়ে দিল শালাকে প্যাঁদাও। শেষমেষ আকেলা ময়দানের বড়ো নর্দমার মধ্যে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সন্ধ্যে বেলা বিধ্বস্ত আকেলা ক্লাবে হাজির। সবাই গালাগাল দেয়। হাসিমুখে আকেলা বলে দ্যাখ আমার জুতোর বাড়ি তো ম্যাচটা বাতিল করে দিল। লব্‌জ যেন শেষ ডিফেন্স।

আমাদের পাড়ার রেখা কাকিমা কোন বাড়িতে কনে এলেই তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। উদ্দেশ্য কনের গয়না দেখা। ওনার লব্‌জ হলো কই গো দেখি ? কনে ভাবে মুখ দেখতে চাইছে। তিনি বলেন না না তোমার গয়নাগাটি। কনের শাশুড়িরা আগেই সাবধান করে দেন। তাই কনেরাও কই গো দেখি সেফ দুরত্বে। যেন সাধু সাবধান।

মা'র এক দূর সম্পর্কের কাকা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে থাকতেন। তখন আমাদের জীবন নিষ্প্রদীপ হয়ে যেত। উনি আমাদের সব কিছু শুনতেন আর বলতেন - খাচ্ছে দাচ্ছে আর তবলা বাজাচ্ছে। ওনার তো ওটা লব্‌জ। কিন্তু মার ভাল লাগবে কেন ? মা একদিন বাধ্য হয়ে বলল সেজকা আমার ছেলেপিলেদের খাওয়ার দিকে নজর দিওনা। ব্যস সেজকাকার সেই শেষ আশা। হয়তো বুঝেছিলেন তাঁর লব্‌জটি নাতিপুতিদের ক্ষতি করছে। কার কথা কোথায় লেগে যায় কে জানে ?

আসলে কথার লব্‌জ যতোই উদ্দেশ্যহীন বা অনর্থক হোক না কেন কোথায় যেন জোর পাওয়া যায়। তাইতো থেমে থাকে না । কি বলবো ভাই।

যোগীন্দ্রনাথ ঃ রত্নদ্বীপে পৌছানোর রূপময় মান্দাস

শ্যামল বেরা

'হাসিখুশি'র কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার। বাংলা শিশু সাহিত্যকে তিনি এক নতুন দিকে, নতুন করে প্রকাশ করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালি শিশুদের শৈশব কেটেছে 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে। 'অজগর আসছে তেড়ে / আমটি আমি খাবো পেড়ে / ইঁদুরছানা ভয়ে মরে / ঈগল পাখি পাছে ধরে' — এক অসাধারণ রসসঞ্চারী শিশুতোষক ছড়া। পড়তে পড়তে শিশু মনের কল্পনা কত দিকে, কত ভাবে যে সঞ্চারিত হয় — তা শিশুরাই জানে এবং বড় হয়ে স্মৃতি রোমন্থনের সময় মনে পড়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বই, বইয়ের বর্ণ, বইয়ের ছবি নিয়ে, কতসব মেদুর ছবি। 'হাসিখুশি' সহ শিশুদের জন্য তিনি ৩০টি বই লিখেছেন — 'খুকুমণির ছড়া', 'ছড়া ও ছবি', 'পশুপক্ষী', 'বনে জঙ্গলে', 'চারুপাঠ', হাসির গল্প', 'হিজিবিজি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা সময় ছিল শৈশব মানেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের ছড়া ও কবিতা।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মের ১৫০ বছর পরেও দেখা যায় তাঁর ছড়া আজও সমান জনপ্রিয়। তিনি জন্মে ছিলেন ২৮ অক্টোবর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরে। পিতা নন্দলাল দেব সরকার, মাতা থাকমণি দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগণার ন্যাতরা গ্রামে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওঘর স্কুলে। তারপর উচ্চশিক্ষা সিটি কলেজে। কর্মজীবনের শুরু ওই সিটি কলেজে। মাসিক বেতন ছিল ১৫ টাকা। শিক্ষকতার শুরুর পর্ব থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'হাসি ও খেলা' বইটি শিশুদের জন্য সংকলিত বাংলা ভাষার প্রথম বই। গ্রন্থরচনার পাশাপাশি শিশুসাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর সময়কালে প্রকাশিত 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক', 'সখা', 'সখী' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি কলম ধরেছেন।

'খুকুমণির ছড়া'র প্রকাশকাল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এর আগেই তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখা - লেখীর সঙ্গে তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থা তৈরি করেন — নাম দেন 'সিটি বুক সোসাইটি'। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। ছোটদের জন্য ৩০টি গ্রন্থ ছাড়া তিনি ১১টি পৌরাণিক গ্রন্থ, ১৩-১৪ টি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'বন্দেমাতরম' নামে একটি জাতীয় সংগীত সংগ্রহ প্রকাশ করেন।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখছেন — 'পড়ার বইয়ের নীরস জগৎ থেকে যোগীন্দ্রনাথই প্রথম ছোটদের হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন সরসতায় ভরপুর এক অন্যজগতে।' গৃহ পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ লিখছেন 'আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই 'ছবি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রইল।'

সার্ধশতবর্ষের আলোকে যোগীন্দ্রনাথ নতুন করে পাঠ বিশ্লেষণের মধ্যে আসবেন - আসাটা স্বাভাবিক। শিশু মন মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ণায়ক। এই শিশু মনের উপযোগী রস-সমৃদ্ধ রচনা উপহার দিয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ। পারিবারিক পরিচয় কমবেশী অনেকেরই জানা। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অষ্টম সন্তান। জয়নগরের পাঠশালায় অধ্যয়ন শুরু। তারপর চলে যান দেওঘরে। সেখান থেকে কলকাতায়। ১৮৯২-এ বিবাহ করেন আটপুরের বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের কন্যা স্বর্ণলতাদেবীকে। গিরিডি-তে একটি বাড়ি করেন। সে বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর, রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোটদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয় 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে। ১৯৩৭-এর ২৬ জুন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

যোগীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পদ। আজকে ইন্টারনেটের যুগেও তাঁর বই আমাদের কাছে সমান আকর্ষণীয়। বিশেষ করে 'খুকুমণির ছড়া'- একটি কালজয়ী সৃষ্টি। এই সৃষ্টির রসদ নিয়েই আমাদের বড় হয়ে ওঠা। তাই, 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতায় কবি শামসুর রহমান অনায়াসেই লিখতে পারেন —

'সেই কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়ো বেয়ে
পৌছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।' কবি শামসুর রহমানের শৈশব কেটেছে 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে কল্পনায় ঘেরা আকর্ষণীয়

রত্নদ্বীপে পৌছানোর অভিজ্ঞতায়। রত্নদ্বীপে পৌঁছানোর চাবিকাঠি দিয়ে গেছেন যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর একটি চমকপ্রদ গান যদি আমরা পাঠ নিই, যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তাহলে তাঁকে স্মরণ করা বিশেষ তাৎপর্য পায়। তাঁর গান —

ছোট শিশু মোরা   তোমরা করুণা   হৃদয়ে মাগিয়া লব
জগতের কাজে   জগতের মাঝে   আপনা ভুলিয়া রব।
ছোটো তারা হাসে   আকাশের গায়ে   ছোটফুল ফুটে গাছে;
ছোট বটে, তবু   তোমার জগতে   আমাদেরো কাজ আছে।
দাও তবে প্রভু   হেন শুভমতি   প্রাণে দাও নব আশা;
জগৎ মাঝারে   যেন সবাকারে   দিতে পারি ভালোবাসা।

ছন্দ-সূর্য ভবানীপ্রসাদ

কল্যাণ দাশগুপ্ত

ভবানীপ্রসাদ,   আহা কী স্বাদ   কী অপরূপ মিষ্টিরে
দহন জ্বালার   তীব্রলীলার   খরার শেষে বিষ্টিরে।
নরম ছড়া   গরম ছড়া   চরম প্রীতি বন্ধনে
ছন্দ গড়ায়   চিত্ত নড়ায়   হৃদয় নাচে স্পন্দনে।

কোল্ড ড্রিঙ্কসের   গোল্ড থিঙ্কসের   ভূতের হ'ল শখ খাওয়ার
ফোর-ফরটি   তাঁর ভোল্ট টি   লক্ষ ওয়াট তাঁর পাওয়ার।
ছন্দে-সূর্য   বাজায় তূর্য   আসর মঞ্চে ছড়ার ভীড়
যাচাই করাবাছাই ছড়া?   সব ছড়া তাঁর আবৃত্তির।

টাটকা হাসি   হয়না বাসি   সূক্ষ্মরসের রসবড়া
দুলকি চালে   ফলকি জ্বালে,   নেই যে স্থূল মশকরা।
মহারসিক   ...িক   জলসা বসান ছন্দিত
সেই ছড়াকা...   স... ...শব্দের বন্দিত।

কে বলে হায়   দাম্ভিকতায়   দূরত্ব তাঁর বিশমাইল?
তাঁকেই ঘিরে   ফূর্তি করে   গুপি, ভোঁদা, ইসমাইল।
আঙুল চোষার   রোগটা ভোদার   সারায় কবির ডাক্তারি
ঘোরেন পাড়ায়,   গঞ্জে, জেলায়;   খোঁজেন লেখার ফাঁক তারই।

বস্তাভরা   ...   ক... বুকের কন্দরে
পরম সুখে   ...ক,   হৃদয়ে নেই দ্বন্দ্বরে।
গায়ে সোয়েটার   ছা... খানার   ছড়ায় দিলেন জন্ম যে
ভরত ভায়ার   রাজা না হওয়ার   কারণ পড়েই মন মজে

মানপত্রে   উপহারে   ঘর ভরা বই - পত্রিকা
নয় হুজুগের   নবীন যুগের   জ্বালান আলোক - বর্তিকা।
আদর ক'রে   ডাকলে তাঁরে   সব আসরেই হন হাজির
ছড়ায় মোড়া   ফুলের তোড়া   দিলাম এ ফুল সব সাজির।

নারায়ণ চন্দ্র রানা — এক ধূমকেতু জীবন

প্রদীপ ভট্টাচার্য

ধূমকেতুরা আকাশের বুকে আবির্ভূত হয় হঠাৎ। কিছুদিন মাত্র তাদের দেখা যায় রাতের আকাশে অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ভিড়ে, নজর কাড়ে বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ মানুষ সবার, তারপর হঠাৎই একদিন বিলীন হয়ে যায় মহাশুন্যের বুকে। আর তাদের দেখা যায় না। শুধু তারা ছাপ রেখে যায় তাদের স্বল্পকালীন অস্তিত্বের — সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে, বৈজ্ঞানিক জার্নালে, লোককথায় বা পুরাণ-প্রবাদে।

এমনই এক ধূমকেতুর কথা বলব এই নিবন্ধে, যাঁর সম্বন্ধে হয়তো খুব বেশী জানা নেই অধিকাংশ মানুষেরই। আবার যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে জানেন - পড়েছেন বা শুনেছেন কারও মারফত কিংবা তাঁর সাক্ষাৎধন্য হয়েছেন তাঁরা সবাই অবাক হয়ে যান তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কথা ভেবে কিংবা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে কতরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করে গেছেন, সেটা ভেবে। বহু প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের মতে, তিনি আজ বেঁচে থাকলে, পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোর্তিপদার্থ বিজ্ঞানী রূপে পরিগণিত হতেন। এই বিজ্ঞানী নারায়ণ চন্দ্র রানা বা সংক্ষেপে এন.সি. রানা, মাত্র ৪২ বছর বয়স হবার আগেই জন্মলগ্ন হৃৎপিন্ডের অসুখে যাঁর জীবনাবসান হয়।

খুব দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজস্ব মেধা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের দরবারে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এমন দুজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের কথা আজ সবাই জানেন — মেঘনাদ সাহা এবং মনি ভৌমিক। এই তালিকার তৃতীয় নামটি নারায়ণচন্দ্র রানার। মনি ভৌমিকের মতো নারায়ণ চন্দ্রও মেদিনীপুরের সন্তান। এখনকার পশ্চিম মেদিনীপুরে দাঁতন বা এগরার কাছাকাছি এক অখ্যাত গ্রাম সাউরি। এই গ্রামেই ১৯৫৪ সালের ১২ই অক্টোবর নারায়ণের জন্ম। তাঁর বাবার নাম রাজেন্দ্রনাথ রানা, মা নাকফুরি রানা। নারায়ণরা তিন ভাইবোন, বোন বিষ্ণুপ্রিয়া আর ভাই সুজন, নারায়ণের থেকে যথাক্রমে ২ আর ১০ বছরের ছোট। বাবা রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতল ও কাঁসার বাসনের ছোটখাটো কারিগর। স্থানীয় কিছু মন্দিরে পিতলের কাজও করেছেন। পরবর্তীকালে নিজের বাড়িতেই একটা পাঠশালা চালু করেন। নারায়ণের পড়াশোনার শুরু এই গৃহপাঠশালাতেই। পরবর্তী পাঠ সাউরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নারায়ণ তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। মুক্তোর মত হস্তাক্ষর আর অঙ্কে অদ্ভুত মেধা। এই দেখেই সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মন্তব্য করেছিলেন - এ ছেলে লম্বা রেসের ঘোড়া। তোমরা দেখবে, এ ছেলে অনেক দূর যাবে।

গ্রামেরই মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ভোলানাথ বিদ্যামন্দির। পুরোন নয়, সদ্য চালু হয়েছে। গ্রামের জমিদার ছিলেন ভোলানাথ চৌধুরী। তাঁরই পুত্র শ্রী সমরেন্দ্র চৌধুরী বাবার স্মৃতিতে ৩০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। সেই জমিতেই গড়ে উঠল স্কুল - ভোলানাথ বিদ্যামন্দির। এই স্কুলেই ১৯৬৩ সালে ক্লাশ ফাইভে ভর্তি হলেন নারায়ণ। এই স্কুল থেকেই তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র হিসাবে তিনি ১৯৬৯ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেন।

ক্লাশ থ্রী থেকেই, সেই সাউরি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পড়াশোনায় তার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন গৌর। গৌরকিশোর রাউত, পরে যিনি একজন ডাক্তার হয়ে উঠবেন। সেই তৃতীয় শ্রেণী থেকেই পরীক্ষায় প্রতিবারই নারায়ণ হতেন প্রথম, গৌর দ্বিতীয়। ক্লাশ টেন পর্যন্ত এর আর ব্যতিক্রম হয়নি। একবার তো স্কুলের সেক্রেটারী ঘোষণাই করে দিলেন, যে নারাণকে পড়াশোনায় হারাবে তাকে তিনি একটি বিশেষ পুরস্কার দেবেন। কিন্তু অদ্ভুত মেধার নারায়ণকে হারাবে কে! অতএব সচিব মহোদয়কে কখনই সেই পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হয় নি।

যে বছর নারায়ণ এবং গৌর ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরে ক্লাশ

ফাইভে এসে ভর্তি হলেন, সে বছরই ওই স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন মনীন্দ্রনাথ লাহিড়ি। এ যেন এক দৈব যোগাযোগ। কারণ, এই মনি স্যারের সান্নিধ্যেই প্রস্ফুটিত হবে নারায়ণের বৈজ্ঞানিক মন। মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনে যিনি জীবনটাকে উৎসর্গ করবেন তার বালক ও কিশোর বয়সের সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও বিশেষতঃ মহাকাশ নিয়ে আগ্রহ জন্ম নেয় এই মনিস্যারের মহাকাশ প্রীতির হাত ধরেই।

আগেই বলেছি নারায়ণ ছিলেন এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাবা রাজেন্দ্রনাথ ও মা নাকফুরির সংসার চলত কায়ক্লেশে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো যখন আচমকাই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। সেটা ১৯৬৫ সাল। নারায়ণ তখন ক্লাশ সেভেনের ছাত্র। স্বল্প আয়ের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষটি চলে গেলে যা হয়, অন্ধকার নেমে এল তাঁদের পরিবারে। তখন এমন হয়েছে দু'বার খাবার জোটেনি সে পরিবারে। কিংবা আক্ষরিক অর্থে শাকফুটিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে হতভাগ্য পরিবারটিকে।

এই অবস্থায় নারায়ণ যে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তার কারণ ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরের সহৃদয় শিক্ষকবৃন্দ। তাঁরা ব্যবস্থা করলেন স্কুল সংলগ্ন হোস্টেলে রেখে তার পড়াশোনার। অভিন্নহৃদয় বন্ধু গৌরও একইদিনে হোস্টেলের বাসিন্দা হলেন। নারায়ণের হোস্টেলের খরচ অনেকটাই মেটাতেন স্কুলের হেডস্যার শ্রীনিবাস নন্দ বাবু, বাকিটা অন্যান্য আবাসিকবৃন্দ। এই সময়েই নারায়ণ খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেতে লাগলেন মনিবাবুর, ইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রী মনীন্দ্রনাথ লাহিড়ির।

এখানে মনীন্দ্রবাবুর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া দরকার। মনীন্দ্রনাথের জন্ম অবিভক্ত বাংলার রংপুরে, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে আসে। ১৯৫৭ সালে বহরমপুর কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরিতে শিক্ষকতা করতে চলে যান। পরে ১৯৬৩ সালে স্বরাজ্যে ফিরে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন সাউরির ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরে, যে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেই থেকে আমৃত্যু তাঁর যোগ ছিল তাঁর প্রিয় এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে। ২৭ বছর তাঁর শিক্ষকতা এই বিদ্যালয়েই। অকৃতদার এই মানুষটির ছোটবেলা থেকেই শখ ছিলো ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, খেলনা, পিনহোল ক্যামেরা এই সব নিজের হাতে তৈরি করা। মহাকাশ ছিলো তাঁর খুব প্রিয়। ছাত্রদের নিয়ে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন নিয়মিতভাবে। তারজন্য তিনি পাউডার কৌটো দিয়ে বানিয়ে নিয়ে ছিলেন টেলিস্কোপ, বানিয়েছিলেন স্টারচার্ট, প্লেনিস্ফিয়ার, এমনকি বাইনোকুলারও। এইসব হাতে কলমে বিজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি লেখালিখিও করতেন। সর্বমোট ৬টি বই তিনি লিখেছিলেন, যেমন - 'চাঁদের দেশে মাটির মানুষ', 'এবারের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ' (১৯৮০), 'ধূমকেতু ও হ্যালির ধূমকেতু' প্রভৃতি। এমনকি 'চাঁদের দেশে মাটির মানুষ' বইটি রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য বিবেচিতও হয়েছিলো, তবে শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। সেই সময় অখ্যাত গ্রামের এক স্কুলশিক্ষকের বেতন কতটুকুই বা ছিল? কিন্তু 'আটপৌরে জীবনযাপন ও মহৎ চিন্তা'র আদর্শে বিশ্বাসী এই মানুষটি তাঁর জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য বই কেনায় বিরত থাকতেন না। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এমনই টান যে আমেরিকার দুটি বিখ্যাত পত্রিকা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' এবং 'স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ' এর নিয়মিত গ্রাহকও ছিলেন তিনি। স্বভাবতই, এমন একজন মানুষ নারায়ণের মতো তীব্র অনুসন্ধিৎসু এবং অসাধারণ মেধার ছাত্র পেয়ে যেন তার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। নারায়ণও সুযোগ পেলেই চলে আসতেন তার মনিস্যারের কাছে। পরবর্তীকালে নারায়ণ ইংল্যান্ড থেকে তাঁর প্রিয় শিক্ষকের জন্য নিয়ে এসেছিলেন একটি ১০ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন। খুবই পরিতাপের বিষয়, ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মানুষটি পৃথিবীর মায়া কাটান ১৯৯১ সালের এক শীতের সকালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। হয়তো একপক্ষে সেটা ভালই হয়েছিলো। নইলে তাঁর প্রিয় ছাত্রের অকাল মৃত্যু সংবাদ তাঁকে সহ্য করতে হতো আর মাত্র পাঁচ বছর পরেই।

ফিরে আসি নারায়ণের কথায়। ১৯৬৯ সালে, আগেই বলেছি, স্কুলের তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র হিসাবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসলেন নারায়ণ এবং গৌর। তার আগেই এই নূতন ইস্কুল থেকে প্রথমবারের জন্য যেন দুটি ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারে, এই আশায় ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা এই সেরা দুই ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করলেন স্পেশ্যাল কোচিং ক্লাসের। ইস্কুলের মাষ্টারমশাই এমনিতেই যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলো না; তার মধ্যেও যেদিন মাষ্টারমশাইদের হাজিরা কম থাকতো, এই দুই ছাত্র নিচের ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব পেতেন। এছাড়াও যখনই কোন ছাত্র

পড়াশোনার কোন ব্যাপারে বুঝতে না পেরে নারায়ণের শরণাপন্ন হতো, নারায়ণ তৎক্ষণাৎ তার মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিতেন। নারায়ণ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনিস্যার বলেছিলেন, "কোন বিষয়েই নারাণ নিজের মতো করে না বুঝে ক্ষান্ত দিত না। কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা ছিল না। ওর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা হিমসিম খেয়ে যেতাম। নারাণের জন্যই আমাকে পড়তে হতো কত। বইও আনাতে হত।"

১৯৬৯ সাল। নারাণের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হলো যেদিন, সেদিনটা সাউরি গ্রামের এক ঐতিহাসিক দিন। রেডিওর খবর মারফত গৌর এবং তার মাধ্যমে গোটা গ্রাম জানতে পারল রাজ্যের সবছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র রানা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পরে জানা গেল একই গ্রাম এবং একই বিদ্যালয়ের গৌরকিশোর রাউত ২৫তম স্থান দখল করেছে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায়। বস্তুত গৌরই প্রথম এই খবর পেয়ে নিজের হাতে মালা গেঁথে এনে নারায়ণকে বরণ করেন। গ্রামে উৎসবের মেজাজ নেমে আসে। সাধারণ গ্রামবাসী থেকে স্কুলের শিক্ষকেরা নারাণকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। শুধু নারাণের মায়ের চোখে অবাক বিস্ময়। আমার নারাণ করেছেটা কি!!

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় দু'জনেই পেল জাতীয় বৃত্তি। স্কুলের শিক্ষকেরা দু'জনেরই থাকার ব্যবস্থা করলেন বেলঘরিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন-এর আশ্রমে। খুব মেধাবী ও ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্ররাই এই বিদ্যার্থী আশ্রমে থাকা, খাওয়া সহ লাইব্রেরির সুযোগ এবং পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারে একেবারে ফ্রী-তে, ওই বৃত্তির টাকার বিনিময়ে। দু'জনেই তৎকালীন প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন এবং বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে যথাসময়ে নারায়ণ ১৩তম ও গৌর ২০ তম স্থান নিয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রত্যন্ত গ্রামে পড়াশোনা করার কারণে তাঁদের ইংরাজীতে লেকচার শোনার অসুবিধা ঘটেছিল বিস্তর। ইংরাজী তাঁরা ভাল বলতেও পারতেন না। প্রি-ইউ এর ফল খারাপের অন্যতম কারণ এটাই। তাছাড়া, নকশাল আন্দোলনের কারণে সে সময় ক্লাসও হতো খুব কম।

১৯৭১ সালে দু'জনেই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এস.সি. পড়তে শুরু করলেও, ছয়মাস পর গৌর ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে নীলরতন সরকার কলেজে ভর্তি হলেন। ক্লাস থ্রী থেকে একসাথে পড়াশোনা করে এই প্রথম তাদের বিচ্ছেদ ঘটল। এই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই প্রথম নারায়ণের শারীরিক অসুবিধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হাঁটার সময় বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে তিনি হাঁফিয়ে যেতেন। কিন্তু সে সময় তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো ট্রেনের অতিরিক্ত ভিড়ের জন্যই এরকম হচ্ছে! যাই হোক ১৯৭৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এস.সি. পাশ করার পর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে তিনি এম.এস.সি. পাশ করলেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখন কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতা অনেকটাই প্রকট হয়েছে। মিশনের মহারাজদের চেষ্টায় চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি মুম্বাই-এর (তখন বোম্বাই) বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান TIFR -এ যোগদানের জন্য পরীক্ষায় বসলেন। পরীক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য ড. জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। মোট ২৫৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭ জন নির্বাচিত হল। প্রথম স্থানে নারায়ণ চন্দ্র রানা।

ড. নারলিকারের তত্ত্বাবধানে নারায়ণ Ph.D করা শুরু করল। এইসময়েই তার বুকে প্রথম পেসমেকার বসানো হল TIFR -এর সহযোগিতায়। TIFR -এর সাহায্য ছাড়া নারায়ণের পক্ষে সম্ভব ছিলো না চিকিৎসার বিশাল ব্যয়ভার বহন করা। ১৯৮১ সালে Ph.D লাভ করার পর সেরা গবেষণাপত্রের জন্য তিনি পেলেন Geeta Udgonkar Medal। TIFR -এ পাকাপাকি ভাবে রিসার্চফেলো হিসাবে যোগদান করা ছাড়াও ১৯৮৩ সালে নারায়ণ পেলেন আর একটি সম্মান — ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স আকাদেমি প্রদত্ত সেরা নবীন বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞান (Best Young Scientist award)। একই বছরে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন পোস্ট ডক্টরেট গবেষণার জন্য। গন্তব্য ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তাঁর শিক্ষক ড. আর্নল্ড ওল্ফডেল, বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী। এখানে তার গবেষণার বিষয় - "কেমিক্যাল ইভলিউশন অফ্ আওয়ার গ্যালাক্সি।" পোস্ট ডক্টরেট গবেষণা শেষ করে নারায়ণ ভারতে ফিরে এল ১৯৮৫ সালে এবং TIFR -এ প্রথমে একজন 'ফেলো' ও পরে 'রিডার' পোষ্টে যোগ দেয়।

১৯৮৬ সালে প্রফেসার নারলিকার TIFR ত্যাগ করে পুনাতে এসে গড়ে তুললেন IUCAA- ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' এবং ডেকে নিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকেও। সেটা ১৯৯১ সাল। সেই থেকে

মৃত্যুর দিন পর্যন্ত 'আয়ুকা' (IUCAA) পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে কাজ করে গেছেন।

তাঁর স্বল্প গবেষণা জীবনে নারায়ণ চন্দ্র রানা বিভিন্ন বিষয়েই গবেষণা করেছেন। প্রায় ৫০টির মতো গবেষণাপত্রের লেখক তিনি। ওঁর গবেষণার বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি মুখ্য, তা হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত নানা বিষয় বা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর থেকে রাসায়নিক মৌলগুলি কিভাবে ধাপে ধাপে গঠিত হল তার তত্ত্বতালাস। সূর্যের ব্যাস নিরূপণে তাঁর গবেষণা খুব বিখ্যাত। এর জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৪শে অক্টোবর যে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়েছিলো, সেই দিনটিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

অধ্যাপক রানা অন্য দুই লেখকের সঙ্গে যুগ্মভাবে দুটি বই রচনা করেছেন যেগুলি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এগুলি হলো 'ক্লাসিক্যাল মেকানিক' এবং 'আওয়ার সোলার সিস্টেম'। প্রথম বইটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ান হয়। এই বই দুটি ছাড়াও তিনি 'চ্যালেঞ্জ অফ্ অ্যাস্ট্রোনমি', 'নাইট ফল অন এ সানি মর্নিং', 'মিথস্ অ্যান্ড সুপারস্টিশন অ্যান্ড দেয়ার ক্ল্যাসিকেল সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশন' প্রভৃতি বইগুলিরও রচয়িতা। এছাড়াও বাংলা এবং ইংরাজি ভাষার নানা পত্রপত্রিকাতে তিনি সাধারণের উপযোগী প্রচুর নিবন্ধ রচনা করেছেন তাঁর অতিব্যস্ত কার্যক্রমের মধ্যেও। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটা বিষয় ছিল এবং 'আয়ুকা'তে তাঁর উপর, বিজ্ঞানকে কিভাবে সকলের উপযোগী করে পেশ করা যায়, সেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

বস্তুতঃ নারায়ণ চন্দ্র রানা সম্পর্কে কথা বলতে বসলে তা দু'চার কথায় শেষ করা যায় না। তাই তাঁর চরিত্রের দু'একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলে এই নিবন্ধে দাঁড়ি টানব।

নারায়ণচন্দ্র ছিলেন রামকৃষ্ণদেব ও স্বামীবিবেকানন্দের ভক্ত। পদার্থবিজ্ঞানের একজন ডক্টরেট হয়েও নামের আগে তিনি এই উপাধি ব্যবহার করতেন না, কারণ সেটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে। এতবড় একজন কৃতি জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সাধাসিধা বিনয়ী ছাত্র। গুরুজনদের প্রণাম করতেন একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। এ বিষয়ে ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরের অঙ্কের মাষ্টারমশাই চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের একটি স্মৃতিচারণ মনে পড়ছে। ১৯৯৫ সালের কোন একসময় খড়্গপুর আই.আই.টি.-তে একটি সেমিনারে যোগ দিতে আসেন নারায়ণ রানা। শেষ দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও বিদ্যালয়ের আরও দু'একজন শিক্ষক। সেমিনার শেষ হবার পর করিডরে অপেক্ষমান মাষ্টারমশাইদের দেখে নারায়ণ সটান শুয়ে পড়ে প্রণাম নিবেদন করলেন মাষ্টারমশাইদের। তাঁর সঙ্গে তখন কৃতবিদ্য আরও বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁরা অবাক, মাষ্টারমশাই অপ্রস্তুত, নারায়ণ কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন।

কিন্তু অন্যদিকে এই শান্ত, লাজুক নারায়ণই ছিলেন খুবই আত্মাভিমানী। নৈতিকতার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মাপকাঠি ছিল। সেই মাপকাঠিতে তাঁর পরিচিত অনেকেই যোগ্যতা অর্জন না করতে পারলে তিনি খুব ব্যথিত হতেন। সহকর্মীদের চালবাজি ও নিষ্ঠার অভাব তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রতিবাদ করতেন এবং ফলে সহকর্মীদের বিরাগভাজন হতেন।

১৯৯৬ সালের জুন-জুলাই মাসটা তাঁর কাটে বিদেশে। ফিরে আসার পরই নারায়ণ চন্দ্র খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পুনার একটি নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এযাত্রায় আর তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসা হলো না। ২২শে আগষ্ট তিনি মিলিয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় মহাকাশে। কাজই ছিলো নারায়ণ চন্দ্রের বেঁচে থাকার রসদ। তাঁর দুরারোগ্য অসুখের পরম ঔষধ। রাত ২টো ৩টে পর্যন্ত তিনি কাজ করতেন। "এই শরীরে এত পরিশ্রম কেন?" — এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতেন, কেউই তো চিরদিন পৃথিবীতে থাকে না। কিন্তু যতটুকু কাজ সে করে রেখে যেতে পারে, আরেকজন তো সেখান থেকেই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ভারতসরকারের অধীনস্থ NCSTC (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সাইন্স অ্যান্ড টেকনলজি কম্যুনিকেশন) তাঁকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করেন একলক্ষ টাকা ও মানপত্র দিয়ে, যেটি তাঁর দুঃখিনী মা নাকফুড়ি দেবী গ্রহণ করেন দিল্লী গিয়ে। কিন্তু এই বিরলপ্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। নারায়ণ চন্দ্রের জীবনী ও আদর্শকে মেলে ধরে এখনকার তরুণ প্রজন্মকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারত, সেটাও কি তাঁর মৃত্যুর এত বছরের মধ্যে করে ওঠা গেছে?

ঋণ স্বীকার *ঃ ইন্টারনেট ও পুনায় CIAA আয়োজিত এন.সি.রানার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা।*

প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সভ্যতার সংকট

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

আমরা আজ যে যুগে বাস করছি তা থেকে যদি ষাট সত্তর বছর পিছনে তাকানো যায় তাহলেই মনটা কেমন শিউরে ওঠে। গ্রামের পর গ্রাম সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খেটেও চাষীর ঘরে দু'বেলা খাবার যোগান নেই। কলেরা, বসন্ত, যক্ষার মত মারাত্মক রোগের মহামারীতে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে হন্টন, সাইকেল বা ভ্যানগাড়ী। ট্রেন-বাস ছিল বটে তবে সর্বত্র নয়। বাড়ীতে আলো বলতে রেড়ির তেল বা কেরোসিনের বাতি, হ্যারিকেন আর সম্পন্ন বাড়ীতে হ্যাজাক। শহরের ছবিটা একটু আলাদা, ইলেকট্রিক আলো ছিল সঙ্গে ছিল লোডশেডিং-এর ব্যারাম, সময়মাফিক কর্পোরেশনের জল ছিল কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। পানীয় জল বলতে একটি বা দুটি টিউবওয়েলেই ভরসা রাখতে হত দু'তিনটি পাড়ার মানুষজনকে।

ছবিটা আমূল বদলে গেছে প্রযুক্তির হাত ধরে। প্রযুক্তির ধাত্রী হিসেবে বিজ্ঞানের নানা শাখা ক্রমাগত পল্লবিত হয়েই চলেছে — আজকের গ্যাজেট বদলে গিয়ে কাল আসছে নতুন গ্যাজেট অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা নিয়ে। আজকের গ্রামে চাষীদের ঘরে নতুন নতুন প্রজাতির ধানের বা শস্যের বীজ, একই জমিতে একাধিক ফসল, সেচের জলের জন্য পাওয়ার টিলার, জমি চষার জন্য আছে ট্রাক্টর। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের আলো, ডিপটিউবওয়েল। প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ — আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে, মানুষের জীবন জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্যের ঘাটতি নেই।

প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির মূলে আছে শক্তি। যখন বোঝা গেল যে কয়লা, তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম এর মত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ভান্ডার অপরিমিত নয় বরং নিত্য ব্যবহারের ফলে ক্রমশ কমে আসছে এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করলে অচিরেই শেষ হয়ে যাবে তখন থেকেই বিকল্প শক্তির খোঁজ শুরু আর কিভাবে এই বিকল্প শক্তি কাজে লাগানো যায় সেই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে ও তার সফল ব্যবহারিক প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক শক্তি ভান্ডারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সূর্যের আলো, বায়ু, জল এই তিন শক্তিকেই সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবহারের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তির সফল বাণিজ্যিক ব্যবহার বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি প্রসারিত করেছে। 'টোকাম্যাক' (Tokamak) যন্ত্রে সংযোজন চুল্লির মাধ্যমে 'কৃত্রিম সূর্য' তৈরীর যে চ্যালেঞ্জ বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন তা আজ সাফল্যের পথে। ফলে প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার আধুনিক সভ্যতায় অগ্রগতির যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক।

মহাকাশ গবেষণায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার মহাবিশ্বের অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছে। প্রায় চার দশক আগে যে 'ভয়েজার' কে দুর্গম মহাকাশে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, সে আজ সৌরজগতের সীমানা অতিক্রম করে চলে গেছে আরো গভীরে গহনে — যাবার পথে জানিয়ে গেছে মহাকাশের বহু অজানা তথ্য। গত শতকের নব্বই এর দশকে স্থাপন করা 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ'ও নিরন্তর ছবি পাঠিয়েছে মানুষের মহাকাশ অভিযানকে আরো সুগম,নির্ভুল করার লক্ষ্যে। এ যুগে মানুষ চাঁদে বসতি গড়ার কথা ভাবছে। মঙ্গলে জল আছে কি না জানার জন্য 'রোভার' এর প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করছে। মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও যা ছিল নেহাৎই কষ্টকল্পনা মাত্র। গত শতকের শেষ দিকে সুপার কন্ডাক্টরের আবিষ্কার পরিবহন ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারকে একধাপে বহুগুণ এগিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রেডিয়োথেরাপি,

কেমোথেরাপির ব্যবহার ক্যানসার চিকিৎসায় অভিনব সাফল্যের সন্ধান দিয়েছে। পাশাপাশি 'কি হোল' সার্জারি, 'রোবোটিক' সার্জারি বা লেসারের ব্যবহার, 'পেট' (Positron Emission Tomography) স্ক্যান, পেসমেকার, স্টেন্ট, উন্নতমানের অ্যান্টিবায়োটিক, জেনেটিক ম্যাপিং বহু জটিল রোগের চিকিৎসায় আজ সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে অনেক কম সময়ে তৈরী হচ্ছে একের পর এক বহুতল, ব্রীজ, টাওয়ার বা মাল্টিপ্লেক্স। উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট গোটা পৃথিবীর সংযোগ ব্যবস্থায় এনেছে যুগান্তকারী বিপ্লব।

প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে এযুগে বেঁচে থাকার কথা ভাবাই যায় না। প্রযুক্তি আজ মানুষের মদগর্বী সভ্যতার অঙ্গাঙ্গী অঙ্গ। গৃহস্থের অন্দরমহলে তার অবাধ যাতায়াত। লোহা, তামা, কাঁসা, পেতল, কাঁচ বাতিলের দলে গিয়ে এসেছে হালফ্যাশানের হালকা প্লাস্টিক, পলিমার। ঘরে ঘরে মোবাইল, কম্পিউটার, ফ্রিজ, টি.ভি., ক্যামেরা, এয়ারকন্ডিশনার। হালকা টেঁকসই প্লাস্টিক আর পলিমারের তৈরী আরামদায়ক সব উপকরণই মজুত প্রযুক্তির কল্যাণে অর্থাৎ কিনা প্রযুক্তির ধাত্রী হিসেবে বিজ্ঞানের উন্নতির হাত ধরে। কিন্তু বিজ্ঞান তো শুধু ধাত্রীর ভূমিকাই পালন করে না, মানুষের চিন্তাভাবনার স্তরেও, চেতনার পরিবর্তন আনে, মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ আর সংস্কারমুক্ত করে তোলে। সে কাজ কতটা হয়েছে প্রশ্ন উঠবে সঙ্গত কারণেই।

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী তারকমোহন দাস একটি বই লিখেছিলেন 'পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য'? এই বইয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃতিতে আছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী, অনুজীব, কীটপতঙ্গ। অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কারণে সকলেই মিলিতভাবে টিকে আছে — সংখ্যায় বাড়ছে না। বাড়ছে কেবল একটিমাত্র প্রজাতি 'হোমোস্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ মানুষ। অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে আজ তার সংখ্যা সাড়ে ছ'শ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন এই মানুষের মাথায় আসেনি যে পৃথিবী তার একার নয়। গাছপালা, ফুল, ফল, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি — সকলের।

১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনের আগে পর্যন্ত পরিবেশরক্ষা নিয়ে কোন দায় অনুভব করেনি 'শিক্ষিত' উন্নত মানুষ। ১৯৯২ সালে ৩-১২ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও তে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল সেখানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সাতটি — ১. গ্রিন হাউস এফেক্ট, ২. সমুদ্রদূষণ, ৩. অরণ্য সংরক্ষণ, ৪. জনবিস্ফোরণ, ৫. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ৬. প্রযুক্তির হস্তান্তর, ৭. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা।

আশ্চর্যের বিষয় এই সাতটি বিষয়ই মনুষ্যসৃষ্ট অর্থাৎ মানুষই এর সৃষ্টিকর্তা আর সমাধানের চাবিকাঠিও তারই হাতে। কিন্তু সম্মেলনে আলোচনাই সার কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

সারা বিশ্বেই পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ধ্বংস হচ্ছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, নির্বিচারে গাছ কেটে তৈরী হচ্ছে রাস্তাঘাট, বহুতল। পরিবেশের এই ধ্বংসলীলায় হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক প্রজাতির অসংখ্য জীব। জলাভূমি ভরাট হওয়ায় কমছে মাছের সংখ্যা। পাশাপাশি সমুদ্র থেকেও প্রতিদিন তোলা হচ্ছে টন টন মাছ ও অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী।

প্রতিদিন টন টন প্লাস্টিক জমা হচ্ছে সমুদ্রের জলে, মাটিতে। কোটি কোটি তস্য কোটি কম্পিউটার চিপস, সিডি, মনিটর, পেন ড্রাইভ, জলের বোতল, সিরিঞ্জ, খেলনা আরো হরেক কিসিমের নিত্য ব্যবহৃত ফেলে দেওয়া জিনিস যা রিসাইকল বা পুনর্ব্যবহার হয় না, মাটিতেও মেশে না তার কি গতি হবে কেউ এনিয়ে ভাবে না। ব্রাজিল, নরওয়ে বা সুইডেনের মত ছোটখাট দেশে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তি আছে যদিও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অধিকাংশই এনিয়ে চিন্তিত নয়।

এই বছরই বণিক সভা অ্যাসোচ্যাম এবং এনইসি'র যৌথ সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। চিন, জাপান, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের নামও রয়েছে বিশ্বের প্রথম পাঁচটি ই-বর্জ্য উৎপাদনকারী দেশের তালিকায়। সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে ই-বর্জ্য উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানে আছে মহারাষ্ট্র যারা গোটা দেশের ১৯.৮ শতাংশ ই-বর্জ্য উৎপাদন করলেও বছরে রিসাইকেল করে মাত্র ৪৭,৮১০ টন পদার্থ। এর পরে আছে তামিলনাড়ু ১৩ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ১০.১ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ ৯.৮ শতাংশ, দিল্লী ৯.৫ শতাংশ, কর্ণাটক ৮.৯ শতাংশ, গুজরাট ৮.৮ শতাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ ৭.৬ শতাংশ। মোটামুটি বছরে গড়ে ২০ লক্ষ টন ই-বর্জ্য উৎপাদন হয় ভারতে। যার মধ্যে কম্পিউটার সংক্রান্ত বর্জের পরিমাণই ৭০ শতাংশ, বাকি অংশের মধ্যে আছে মোবাইল ১২ শতাংশ, ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ ৮ শতাংশ এবং চিকিৎসাক্ষেত্রের বর্জ্য ৭ শতাংশ। সমীক্ষায় আরও

প্রকাশ প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে গড়ে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ই-বর্জ্যের উৎপাদন। যার মূল্য ৪ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি, যে টাকা বিশ্বের একাধিক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশ কয়েকগুণ।

ভারতে ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। কর্নাটকে ৫৭টি কেন্দ্রে বছরে ৪৪,৬২০ টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ হয়, মহারাষ্ট্রে ৩২ টি কেন্দ্রে ৪৭,৮১০ টন, হরিয়ানায় ১৬টি কেন্দ্রে প্রায় ৫০,০০০ টন, তামিলনাড়ুর ১৪টি কেন্দ্রে প্রায় ৫২,০০০ টন, গুজরাটে ১২টি কেন্দ্রে মাত্র ৩৭,২৬২ টন, রাজস্থানে ১০টি কেন্দ্রে ৬৮,৬৭০ টন এবং তেলেঙ্গানায় ৪টি কেন্দ্রে ১১,৮১০ টন সবমিলিয়ে গোটা দেশের ই-বর্জের মাত্র ৫ শতাংশ সংগঠিত ভাবে প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে, বাকি অংশ ছড়িয়ে আছে দেশের যত্রতত্র।

মানুষ মোটেই চিন্তিত নয় নিউক্লীয় বর্জ্যের গতি কি হবে তা নিয়ে বা ক্রমবর্দ্ধমান অস্ত্রসম্ভার নিয়ে যা আধুনিক প্রযুক্তিরই অবদান। সিরিয়ায় লাগাতার বোমাবর্ষণের ফলে কী হারে মানুষ মারা যাচ্ছে তা তো আমরা অহরহ দেখতেই পাচ্ছি। 'গালফ ওয়ার' কী বীভৎস মৃত্যু মিছিল ডেকে এনেছিল তাও আমাদের দেখা। হিরোসিমায় ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট যে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেখানে একলপ্তে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ৭৫,০০০ মানুষ, পরে আরো লাখ দু'য়েক। সে বোমার ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৫ কিলোটন। আজ ৫০ মেগাটনেরও বেশী ক্ষমতার বোমা মজুত আছে পৃথিবীর সবকটি উন্নত দেশেই। আছে প্রচুর বিধ্বংসী মিসাইল আর নানা ধরনের মারণাস্ত্র। সবই আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী। মাত্র গোটা তিনেক দেশ যদি এগুলির সদ্ব্যবহার করে সভ্যতার পরিণাম কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রকৃতি

বিক্রমজিৎ ঘোষ

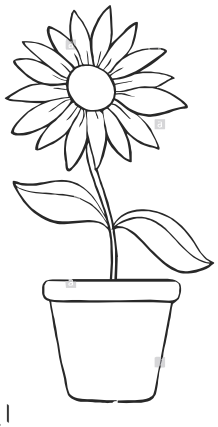

সবুজ ঘাসের মাঝে
কয়েকটা টবের ফুলগুলো
প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।
বাগানের গাছগুলো
সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে।
সুন্দর বয়ে যাওয়া বাতাস
আবহাওয়াকে মনোরম করে তুলেছে।
ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দুগুলো
ছলছল চোখে তাকাচ্ছে
শান্ত, মনোরম বাতাস আর
রঙ চড়ানো দৃশ্য আমাদেরকে
আনন্দ দিচ্ছে।

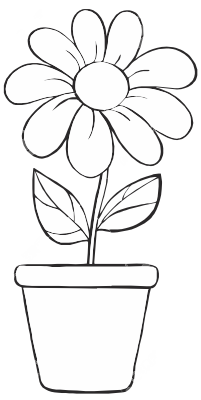

সেবক

উদয়শঙ্কর বাগ

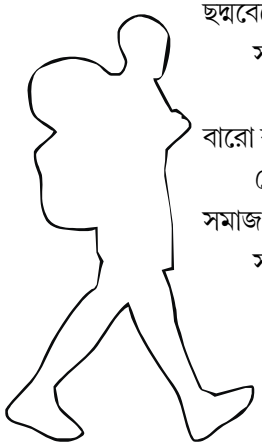

ঘুরছি আমি জেলায় জেলায়
সবাই আমায় চেনে,
কেউ রাখছে ভালোবেসে
কেউবা বুকে টেনে।

কী করে আর থাকবো দূরে
ওদের কথা ভেবে!
ছদ্মবেশে ঘুরলেও ঠিক
সবাই চিনে নেবে।

বারো বছর কাটলো এবার
জেলা সফর করে
সমাজ সেবায় মাতবো রোজই
সারাজীবন ধরে।

হাতের লেখার সঠিক দিশা

মহুয়া দাস চট্টোপাধ্যায়

শিশু ২ বছরের হলেই আজকাল বাবা-মা স্কুলে ভর্ত্তি করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন এবং শুরু হয়ে যায় পড়া লেখার পালা। প্রতিযোগিতায় থাকতে গেলে এছাড়া বোধ হয় উপায়ও থাকে না অভিভাবকদের। আর স্কুলে ভর্ত্তির কয়েক মাসের মধ্যে স্কুলের চাপে বা নিজেদের মানসিক চাপে আমরা আশা করে ফেলি শিশুটি সম্পূর্ণ লেখা শিখে ফেলবে। এরকমটা যে শিশুরা পারছে না তা নয় তবে সবাই পারছে না। আর সেই না পারার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। না পারাটাই যে স্বাভাবিক সেটা বোঝার সময় স্কুলের হয়ত নেই। কিন্তু অভিভাবকদের একটু ভাবতে হবে।

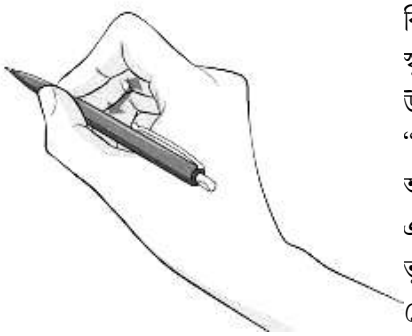

একটি শিশু সঠিকভাবে লিখতে শেখার জন্য তার ৪ বছর ৬ মাস বয়স হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে প্রশ্ন আসবে অনেক শিশুই লিখছে এবং ভালো লিখছে কেমন করে? অবশ্যই লিখছে। তাদের আমরা বাহবা দেব। কিন্তু যে পারছে না তাকে ভৎর্সনা করব না বা চাপ দেব না। কারণ সেটা তার অন্যায় নয়। আমাদের সময় এই কারণেই বোধ হয় ৬ বছর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তির ব্যবস্থা ছিল। আর আজও মাধ্যমিক ১৬ বছরেই দেওয়ার নিয়ম। শিশুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে লেখালে শিশুর লেখার প্রতি ভীতি জন্ম নেয়। পরে তা পড়ালেখার প্রতি অনীহার কারণ হয়ে ওঠে।

শিশু কোন্ হাতে লিখবে - এ নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়। কোন শিশুকে বাঁ হাতে কাজ করতে দেখলেই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করি তাকে ডান হাতে লেখানোর বা কোন কাজ করানোর। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত এটা বোঝার যে শিশুটি কোন হাতে সাবলীল। সেক্ষেত্রে একটি ছোট্ট খেলা ওর সাথে করা যেতেই পারে। যেমন একটি বল রেখে ওকে দেখিয়ে দেওয়া হল - বলটি কিছু দূরের একটি ঝুড়িতে গিয়ে রেখে আসতে হবে, ১০ বার ডান হাতে আর ১০ বার বাম হাতে। শিশুটি যে হাতে কাজ করতে সাবলীল দেখা যাবে অন্য হাতের তুলনায় সেই হাতে বেশিবার কাজটি করল। সেটি বোঝার পর তাকে এটুকু স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ যে সে তার স্বচ্ছন্দ বোধ হবে যে হাতে সেই হাতেই লিখবে। এর অন্যথা করলে হাতের লেখা খারাপ হতে পারে। এমনকি খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করলে শিশুটির পড়ালেখার প্রতি আগ্রহও কমে যেতে পারে।

লিখতে তো শিখল - কিন্তু হাতের লেখা নিয়ে সমস্যা। এই সমস্যারও নানা কারণ আছে। প্রথমেই দেখতে হবে শিশুটির পেন্সিল ধরার কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাইজের পেন্সিল বাজারে এসেছে। সেগুলি ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে তাতে কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। অনেকে বাড়িতে খুব সুন্দর লিখছে স্কুলে গিয়ে লেখা খারাপ হচ্ছে। আবার উল্টোটাও দেখা যায়। প্রায়ই শোনা যায় "ম্যাম স্কুলে এত সুন্দর লিখছে বাড়িতে আমাদের কাছে লিখতে চাইছে না।" এক্ষেত্রে বসার ব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুলের বেঞ্চে যেভাবে বসে লিখছে বাড়িতে লেখার সময় যদি সেভাবে না বসে তাহলে হাতের লেখার তারতম্য হওয়া খুব স্বাভাবিক। অনেক স্কুলের বেঞ্চ কিছুটা হেলানো থাকে লেখার সুবিধার জন্য। বাড়িতে হয়তো তেমনটা সম্ভব হয়নি। যদি খেয়াল রেখে স্কুলে আর বাড়িতে পড়ালেখার জায়গায় বসার ব্যবস্থায় একটা সমতা রাখা যায় শিশুদের পক্ষে সুবিধা হয়।

কিছু কিছু ছোটদের মধ্যে প্রচন্ড চাপ দিয়ে পেন্সিলে লেখার একটা সমস্যা দেখা যায়। এতটাই চাপ যে খাতাও অনেকসময় ছিঁড়ে যায়। আবার কেউ এমন লেখে খাতায় পেন্সিলের দাগ বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে যারা চাপ কম দিয়ে লিখছে তাদের বাড়িতে Hard pencil (H) দিতে হবে, যার ফলে ও চেষ্টা করবে একটু চাপ দিয়ে লিখতে যাতে খাতায়ও লেখাটা দেখতে পায়। আর যারা বেশি চাপ দিয়ে লিখছে তাদের অবশ্যই Soft pencil (B) পেন্সিল দিতে হবে। তাছাড়াও বড়িতে আটা ময়দা মেখে থালার ওপর সেটা সমান ভাবে রেখে তার ওপর পেনসিল দিয়ে লেখার অভ্যাস করালে শিশুটির অভ্যাসের পরিবর্তন হতে পারে।

মেডিটেশন বা মনের ব্যায়াম

মৌসুমী চক্রবর্ত্তী

মেডিটেশন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল ধ্যান। যার অর্থ হল প্রগাঢ় চিন্তা। প্রাচীন যুগ থেকে মেডিটেশনের প্রচলন আছে। পূর্বে মুনি ঋষিদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল বেশি। বর্তমানে তা পরিবর্তন হয়েছে। আজকের যুগে মেডিটেশন শব্দের সাথে সকলেই পরিচিত। কিন্তু মেডিটেশন আসলে কী? কীভাবে করতে হয়? এটা করলে কী উপকার পাওয়া যায়? এই বিষয় সম্পর্কে কিছু মানুষের কাছে এখনও অজানা। সেই অজানা ও যারা জানেন তাদের আরও বেশি করে জানানোর জন্যই এই আলোচনা।

মেডিটেশন একটা খুবই পরিচিত শব্দ। মেডিটেশন হল একপ্রকার চিন্তন বা মনের ব্যায়াম। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে অনুভব করতে পারে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বাইরের সমস্ত চিন্তা দূর করে একটি মূর্ত বিষয় চিন্তা করাই হল মেডিটেশন। মেডিটেশন হল ব্যক্তির নিজের লক্ষ্যে পৌছানোর একটি পথ। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি খুব সহজেই নিজের জীবনকে আনন্দময় করে গড়ে তুলতে পারে। মেডিটেশন হল অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার একটি সহজতম উপায়।

এককথায় বলা যেতে পারে মেডিটেশন হল সচেতনভাবে দেহ, মন, মস্তিষ্ককে শিথিল করার আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও সহজতম উপায়। মেডিটেশন বিভিন্ন প্রকারের হয় —

১. বাহ্যিক মেডিটেশন ঃ চোখ খুলে সামনে বা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

২. অন্তর্মূখী মেডিটেশন ঃ মনের গভীরে কাউকে না জানিয়ে মেডিটেশন ।

৩. জ্যোতি মেডিটেশন ঃ কোন জ্যোতিকে লক্ষ্য করে মেডিটেশন।

৪. শব্দ মেডিটেশন ঃ কোন ছন্দ বা সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনঃসংযোগ।

৫. প্রাণায়ম ঃ বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে মেডিটেশন।

৬. শব মেডিটেশন ঃ শবাকৃতি হয়ে বা শুয়ে মেডিটেশন।

৭. সহজ মেডিটেশন ঃ বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে নিজেকে মেডিটেশনে নিযুক্ত করা।

মেডিটেশনের প্রয়োজন কেন ঃ

বর্তমান যুগে মেডিটেশন বা ধ্যান খুবই প্রয়োজন। আধুনিক যুগে মানুষ এত বেশি কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের মধ্যে মানসিক টেনশন খুব বেশি বেড়ে গেছে। আজকের যুগে মানুষ অল্পেতেই বিরক্ত বোধ করে। তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্বই ভুলতে বসেছে। কি করা উচিৎ, বা কি করা উচিৎ নয় সেই সব সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও অনেক সময় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তাছাড়া রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানান সমস্যা। এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথই হল মেডিটশন।

আমাদের যেমন দেহের ক্ষয়পূরনের জন্য খাদ্য ও বিশ্রামের দরকার তেমনি মনের ক্ষয়পূরণের জন্য মেডিটেশন প্রয়োজন। মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটাতে পারি। জীবনকে অনেক আনন্দময় ও সুখকর হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। বর্তমান যুগে মানুষের বেশির ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে টেনশন। এরফলে সৃষ্টি হয় মাথার যন্ত্রণা, মধুমেহ, বাত, হজমের গোলমাল, অনিদ্রা এছাড়াও একাধিক রোগ। এই সকল রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে মেডিটেশনের খুবই প্রয়োজন। শুধু অসুখ ছাড়াও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে আরো উন্নত ভাবে গড়ে তোলার জন্য মেডিটেশনের প্রয়োজন। যেমন গৃহিণীরা সংসারের নানান ধরনের

দায়িত্ব পালন করে থাকে, আর এই দায়িত্ব পালন করতে করতে কখনও কখনও সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই বিরক্তি দূর করা যায় মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে ঠিক সেরকমই একজন পেশাজীবি ব্যক্তি কর্মস্থলে মস্তিষ্ককে ঠান্ডা রেখে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, ছাত্রজীবনেও পড়াশোনার উন্নতি ঘটানো যায় মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। এককথায় বলা যেতে পারে আধুনিক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির চলার পথেই মেডিটেশনের প্রয়োজন। নিজের মনকে শান্তি, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি ও নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার জন্য মেডিটেশন প্রয়োজন।

আমরা মেডিটেশন করব কীভাবে?

মেডিটেশন বিভিন্ন ভাবেই করা যেতে পারে। তবে বিশেষ কিছু সময় ধরে করলে এর উপকার বেশি পাওয়া যায়। আর কখনই ধুলো ময়লা ও নোংরা জায়গায় মেডিটেশন করা উচিত নয়। পরিষ্কার পরিবেশে ধ্যান করা উচিত।

প্রথমে এমনভাবে বসতে হবে যাতে শরীর সম্পূর্ণ আরাম অনুভব করে। তা চেয়ারে বা মেঝেতে যে কোন জায়গায় বসা যায়। খালি মেঝেতে বসে মেডিটেশন করা উচিত নয়। মেঝেতে বসলে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসে মেডিটেশন করাই ভালো। প্রথমে নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিতে হবে মুখ বন্ধ করে। তারপর ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়তে হবে। এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার করতে হবে। তারপর কোনো ভালো ও সুখকর ঘটনা মনে মনে চিন্তা করতে হবে। কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করার পর নিজেকে অনুভব করুন। বুঝতে পারবেন নিজের মন কতটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

চোখ বন্ধ করে নিজেকে চিন্তা শূণ্য করতে হবে। তারপর মনে মনে বলতে হবে আমি আত্মা, আমার অবস্থান দুই ভ্রুরুর মাঝে এক জ্যোতির বিন্দুস্বরুপ উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। বেশ কয়েকবার বলার পর নিজেকে অনুভব করুন।

মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিতে নিতে ভাবুন আপনার শরীরে তরতাজা পরিষ্কার শুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করছে বা পজিটিভ এনার্জিতে শরীর ভরে যাচ্ছে। আর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীর থেকে নোংরা দুষিত নেগেটিভ এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুবার এই প্রক্রিয়া করার পর নিজেই অনুভব করতে পারবেন শরীর কত হালকা হয়ে গেছে।

উপকারিতা ঃ মেডিটেশনের উপকারিতা অসীম। যা বলে শেষ করা যাবে না। তবে বিশেষ কিছু উপকারিতার উল্লেখ করা হল -

১. মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে দেহ মনের উন্নতি ঘটে। মনের মধ্যে অসাধারণ সাহসিকতা জাগ্রত হয়। শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

২. শরীরে মেটাবলিক ও হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৩. শরীরের টক্সিন কমে যায় ও শরীর মন সুস্থ থাকে।

৪. বিভিন্ন গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যার সমাধান হয়।

৫. গভীর রিলাক্সেশন অনুভূতি হয়।

৬. ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

৭. কোন কিছু জিনিসের প্রতি মনসংযম করতে সাহায্য করে।

৮. ব্যক্তির মধ্যে একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়।

৯. মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত লোভ লালসা, হিংসা, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির পরিমাণ কম হয়।

১০.ব্যক্তির মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

১১. মনে আনন্দ আসে, শরীর স্বাস্থ্য সতেজ হয়, কাজ কর্মে মন লাগে।

১২. মনের জড়তা দূর হয়ে যায়।

১৩. দেহের স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য ফিরে আসে।

১৪. মেডিটেশনের ফলে ব্যক্তির বয়স বোঝা যায় না। শরীরের গঠনও একই থাকে।

১৫. ব্যক্তি খুব সহজেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে ও হঠকারিতা কমে।

১৬. ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

১৭. বিভিন্ন সম্পর্ক ঠিক রাখতে সাহায্য করে, জীবনকে অনেক রঙিন ও আনন্দময় করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ব্যক্তি পরিবারের মানুষদেরও খুশি রাখতে সাহায্য করে।

১৮. কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

১৯. স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তোলে।

২০. মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত করে ও ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে।

শেষ সময়ে

উত্তম কুমার পাল

তাহলে! তাহলে আর কী হবে চলো আজকের মত পাততাড়ি গুটিয়ে রওনা দেওয়া যাক কেমন?

তাছাড়া আর উপায়ও তো দেখছি না। মৃণালের সম্মতিতে কোন সকাল থেকে বসে আদিত্য বিরক্ত হয়ে উঠেছে তাই আর নয় এবার তাদের ফিরতে হবে কিন্তু কী কৈফিয়ৎ দেবে বাড়িতে।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিল দুই বন্ধু মাছ ধরতে। পাশ দেওয়া পুকুর, এক দিনের জন্য পাঁচশ টাকা পাশ একটা বসার জায়গা। দুটো বা তিনটে ছিপ রাখা যেতে পারে।

গত রোববারেই তো ঐ পুকুরে জাল দেওয়া হয়েছিল। পাশে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা সবাই দেখেছিল পুকুরে কী আছে কী নেই। জালের মধ্যে যে মাছ দেখা গিয়েছিল তা দেখে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল ছিল। আরিব্বাস এই পুকুরে ছোটো বড়ো এত্তো মাছ। তবে তো যেমন করে হোক পুষিয়ে যাবে, লোকসান হবে না।

অনেকেই তাদের সাধ্যমত চার বা মাছের খাবার তৈরী করে এনেছিল যাতে মাছ গুলোকে নিজের আয়ত্বে রেখে সহজে ধরাশায়ী করতে পারে কিন্তু সব মাছই যে এভাবে মালিকের দাস হয়ে যাবে সে কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। মৃণাল মেছুরে নয় কিন্তু চার তৈরীর অভিজ্ঞতা তার অনেক দিনের। আদিত্য তাই মৃণালকে সঙ্গে এনেছিল।

পাশের পাঁচশো টাকা, তিনটে ছিপ না হয় সে একবারই কিনেছে কিন্তু চার তৈরী করতে সেওতো তিনশো টাকা, তারপর দুজনের রোজগন্ডা। হায়রে মাছ ধরার নেশা। শুধু কি ওদের দু'জনের, তা তো নয় এমনই কত মানুষ যে যোগ দিয়েছে তার কি হিসাব আছে। চারপাড় মিলিয়ে অন্ততঃ চল্লিশটা বসার জায়গা করেছে পুকুরের মালিক।

তবে কি তুক তাক করে মাছগুলোকে বশে রেখে দিয়েছে কোন এক জায়গায়? এই বিজ্ঞানের যুগেও বশীকরণ? হয়তো হবে তাই, অবিশ্বাসেরই বা কী আছে? খবরের কাগজ খুললে তো রঙিন ছবি দিয়ে বশীকরণে অদ্বিতীয় বিজ্ঞাপন নজরে পড়বেই। কাজ না হলে টাকা ফেরৎ। এতো বড়ো কথা যদি জ্যোতিষীরা জোর গলায় বলতে পারে তাহলে পুকুরের মালিকই বা করতে পারে না কেন? আদিত্যর মনে পড়ে একটা গরুর কথা।

গরু কিনতে গেলে দুধ দেখে গরুর দাম হয়। গরুর মালিক দুধ দোহন করে যত পোয়া দুধ দেখাতে পারবে সেই হিসাব মত দাম হবে। আদিত্য যখন গরুটা দেখতে যায় তখন গরুটা একটন দু'কিলো দুধ দেয়। দেখেশুনে আদিত্য খুব খুশি, যা দাম দিতে হয় হোক বাড়ির সকলেই মচ্ছিমুলো করে দুধ খেতে পারে। চারশো টাকা পোয়া হিসাবে বত্রিশশো টাকা দাম হল। তিন হাজার টাকা দেবো বলতে গরুর মালিক এক কথায় রাজি হয়ে যায়। হাসতে হাসতে নগদ টাকায় গরুটা কিনে নিয়ে বাড়ি আসে আদিত্য। পীরের কাছে দুধ দেওয়ার মানত করে গরুটাকে স্নান করিয়ে ঘরে তোলে। তারপর আজ নয় কাল, আজ নয় কাল করতে করতে একদিনও এক কিলোর বেশি দুধ দিল না। আদিত্য হতাশ। তার মুখের ভাষা শুকিয়ে গেল। যার কাছ থেকে গরু কিনেছিল তাকে দিয়ে একবার দোহন করে দেখল ঠিকই দুধ দিচ্ছে। আর কারো হাতে বেশি দিতে চায় না।

কত কাঠখড় পোড়ালো, সব পীর ফেল হয়ে গেল শেষে আদিত্য গরুটাকে বেচতে বাধ্য হল। এ কি সেই গরুর মালিকের বশীকরণের ফল? সেই ভাবেই কি পুকুরের মালিকও মাছগুলোকে বশীকরণ করে রেখেছে? গরুটার মত একেবারেই হতাশ হয়নি কেউই। দু'পাঁচশো থেকে দু'পাঁচ কিলো মাছ কম বেশি অনেকেই ধরেছে। সেটা কথা নয় সকলেই আশা করেছিল নিদেন পক্ষে খরচ উঠে আসবে। সবার হিসাব না নিলেও বেশির ভাগ মানুষকেই হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। ধৈর্য্য হারা হয়ে বেশিরভাগই পাততাড়ি গুটিয়েছে। মৃণালের মত জনা চারেক সাজ সরঞ্জাম তখনো সব গুটিয়ে ওঠেনি। মন যেন উঠতে চাইছে না। একদিকে লোভ অন্যদিকে খরচ ওঠানো। যাদের সখের মাছ ধরা, যাদের রোববারের অবসর কাটাতে দূর দূর থেকে নেশার ঝোঁকে মাছ ধরতে এসেছে তাদের ব্যাপার আলাদা কিন্তু আদিত্য আর মৃণাল? ওদের খুব গায়ে লাগছে, এরকম ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেনি। নিদেন পক্ষে খরচের টাকা না তুলে কোনদিন ফেরেনি।

পশ্চিমদিকে অস্তগামী সূর্য। তার শেষ রশ্মি পুকুরের জলে এসে পড়েছে। ঝির ঝির বাতাস বইছে। সেই বাতাসে যে ঢেউ

উঠছে সেই ঢেউয়ে সূর্যের তীর্যক আলো ঝলমলিয়ে উঠছে। যেন যাত্রার আসরে রাজার প্রবেশ। হিরে জহরত মণি মুক্তো খচিত পোষাকে বৈদ্যুতিন আলো পড়লে যেমন ঝলমল করে তেমনি ঝলমলিয়ে উঠছে পুকুরের জল। আদিত্য বলে উঠল হু-র-র-রে এই শেষ সুযোগ এই সময়ে যদি একটা কিছু হয়তো হতে পারে। একটা ছিপ তুলে নিয়ে সেই ঝলমলে জলের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল জয় ভোলানাথের জয়, শেষ রক্ষে করে দিও বাবা, তারপরেই কপালে তিনবার পেন্নাম ঠুকে নিল। যেমনি ফেলা অমনি ফৎনায় টান। মৃণাল বলে উঠল 'গুরু মার দিয়া হ্যায় কেল্লা।'

-- চুপ চুপ, একদম কথা নয়, ব্যাটা ঝলমলে রোদ দেখে নেশা ছেড়ে উঠে এসেছে একটু থিতি হতে দে যাতে ছেড়ে যেতে না পারে।

সকলে সেদিকে তাকিয়ে, শেষ মুহূর্তে আদিত্যের ছিপ খেলা দেখাচ্ছে।

খেলাতে খেলাতে সন্ধ্যায় ঝুঁঝকো আলোয় যাকে ধরাশায়ি করল সে আর কেউ নয় পুকুরের মালিকের সখের রুই যার নাকে নখ পরানো আছে। বাক বিতন্ডার শেষে পুকুরের মালিক আদিত্যকে নগদ দু'হাজার টাকা দিয়ে মাছটাকে নিজের পুকুরেই রেখে দিলেন।

অসুর যাবে শ্বশুরবাড়ি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

অসুর যাবে শ্বশুরবাড়ি পশুর পায়েস খেতে
পুজোর ক'দিন এবার রঙিন কাটবে আনন্দেতে।
তাইতো অসুর ভুলেই কসুর খাচ্ছে লুটোপুটি
পুজোর সময় কোনদিনও পায় না এমন ছুটি।
পুজোর ক'দিন প্যান্ডেলেতেই থাকে মায়ের সাথে
পা দিয়ে মা রাখেন চেপেই জোরসে ত্রিশূল হাতে।
গন্‌শা-কেতো, লখাই-সুরো সব পাহারায় থাকে
একটু এদিক-ওদিক হলেই দেয় লাগিয়েই মা-কে!
গভীর রাতে একটা যদি ধরায় পোড়া বিড়ি
ঘুম ভাঙিয়েই দেবে মায়ের সব্বাই শিগ্‌গিরি।
কিংবা যদি চুপিচুপিই একটু খৈনি বানায়
বিচ্ছুগুলো মা-কে ডেকেই তক্ষুনি তা জানায়।
কেমন জব্দ পাঁচজনই আজ?
দেখছো আঁধার দুনিয়া?
কারো ডেঙ্গু, কারো কালাজ্বর,
কারো চিকুনগুনিয়া।
পুজোর ক'দিন বেড়ে শুয়েই
খাও ঝোল-ভাত-রুটি
আমি চললাম শ্বশুরবাড়ি,
আমার লম্বা ছুটি।

আগমনীর আগমণ

মিত্রা ঘোষ

শরতেরই সোনালি আলো
দেখবো আকাশ জুড়ে,
আনন্দেরই আগমনী —
আসবে মোদের ঘরে।
শিশির ভেজা সকালবেলা
চারিদিকে কাশের মেলা।
মন্ডপেতে বাজবে ঢাক, আসবে সে সুদিন,
খোকা খুকু নাচবে সবাই
তাধীন তাধীন ধীন।
পঞ্চমীতে ঢাকে কাঠি,
ষষ্ঠিতে মায়ের বোধন —
সপ্তমীতে মোদের গৃহে
মায়ের আগমন।
অষ্টমীতে ঘরে ঘরে
লুচি, মিঠাই, পান।
নবমীতে মন্ডপেতে হবে বলিদান।
দশমীতে হবে মায়ের পূর্ণবিসর্জন,
প্রতীক্ষায় থাকবো মোরা -
আবার বছর ক্ষণ।।

দীক্ষা নিলেন পরমেশ্বর

উপল পাত্র

পরমেশ্বর পড়েছেন মহা মুস্কিলে। সমস্যাটা আর্থিক বা জাগতিক নয় যে সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁর চেনাজানা লোকজনের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। আর্থিক বা জাগতিক সমস্যা সমাধানে পরমেশ তাদের পাশে পাবেন - এমন নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু সমস্যাটা হলো পরমার্থিক। তার মধ্যপঞ্চাশে এখনও ঈশ্বরচিন্তা, পরলোক জিজ্ঞাসা এসব কোনটাই এলনা। এখনও তাঁর স্বভাবের চপলতা অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চন করে। আড়ালে কেউ কেউ বলেও ফেলে ভীমরতি হয়েছে এই বয়েসে। গিন্নি তো বলেন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, কোথায় ধম্ম-কম্মে মন দেবে তা নয়, এখনো হ্যাংলামি, ছোঁকছোঁকানি গেল না।

দোষের মধ্যে পরমেশ সেদিন ফ্যাশান টিভিতে স্বল্পবসনা সুন্দরীদের ক্যাটওয়াক উপভোগ করছিলেন। গিন্নি ঘরের ময়লা পরদাগুলো খুলে কাচা পরদাগুলো দরজায় লাগাতে বলেছিলেন। পরমেশ খেয়াল করেননি। গিন্নি ফটাস করে টিভিটা বন্ধ করে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বয়স বাড়ছে না কমছে, মেয়ে বড় হচ্ছে, লজ্জা করে না তোমার?

এতে লজ্জার কী আছে রমা, সৌন্দর্য তো উপভোগের জন্য। আর বয়স? সাহেবরা কী বলে জান না - পঞ্চাশে জীবনের শুরু। বিদেশে সাহেব-মেমেরা এই বয়েসে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, সে কথা জান?

কেন, তোমার আবার পিঁড়িতে বসার শখ হয়েছে বুঝি? বুড়িকে পছন্দ হচ্ছে না, ছুঁড়ি চাই। বলি কথায় কথায় যে বিদেশ দেখাও, তুমি কি বিদেশে আছ না সাহেবদের গুরু ঠাওরেছ। অ্যাঁ? যত্তসব। অপিসে অল্পবয়েসি মেয়েদের সঙ্গে কীসের অত গুজুর গুজুর বলতে পার?

পরমেশ অবাক হয়ে যান। অফিসে নতুন টাইপিস্ট দীপার সঙ্গে দুটো কথা বলেছিলেন বটে। সে খবরও বাড়িতে চলে এসেছে?

কে, কে বললে ওসব কথা? পরমেশ ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

কে আবার, তুমিই তো বললে, অপিসে একটা মেয়ে নতুন জয়েন করেছে। ভুলে গেলে? সেই মেয়েটা সকালে ফোন করেছিল। পরমদা আছেন? আহা ঢং দেখলে বাঁচি না, পরমদা।

কী, কী বললে তুমি?

বললাম বাজারে গেছে। আর যা বলার অপিসেই বলতে। অপিসে যখন দেখা হবে তখন বাড়িতে ফোন কেন?

তুমি এসব বলেছ নাকি?

না বলার কি আছে? অন্যায় কিছু বলেছি? আমি কি কাউকে ভয় পাই নাকি। আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলতো? তুমি কি আমায় সন্দেহ কর?

শুধু তোমায় কেন, তোমার বয়েসি সব পুরুষকেই সন্দেহ হয়। মেয়ে দেখলেই হোল। তোমরা, পুরুষেরা সব সমান। শোন, ঢের হয়েছে। সামনের গুরু পূর্ণিমায় তুমি দীক্ষা নেবে। গুরুদেবের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

পরমেশ আঁতকে উঠে বলেন, সে কী। এখনই দীক্ষা টিক্ষা কেন? বলেছি তো আমার ওসব আসেনা।

এখনই মানে!! পঞ্চান্ন বছরেও দীক্ষা না নিলে আর কবে নেবে? পরকাল মানো তো নাকি?

পরমেশ বুঝলেন তিনি ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন, একটু ফুঁসে ওঠা দরকার। চীৎকার করে বললেন না, আমি পরকাল, পূর্বজন্ম, পাপপূণ্য, স্বর্গ-নরক কিছু মানি না। আমি ইহকালে বিশ্বাস করি। জীবন একবার পেয়েছি, চুটিয়ে ভোগ করে যাব তোমার কিছু বলার আছে?

পরমেশের এ রূদ্ররূপ রমা দেখেননি। কান্নাভেজা গলায় বলেন, আজ বলছ পরকাল মানি না, কোনদিন শুনব আমাকে আর আমার মেয়েকে মান না। তোমার রোজগারে আমরা খাই তুমি তা বলতেই পার। তোমরা সব পার।

তারপরেই স্বমূর্তি ধারণ করে রমা বলে ওঠেন, দেশের আইন এখন আমাদের পক্ষে। এখুনি ৪৯৮-এ ফেলে তোমার লম্প-ঝম্প বন্ধ করে দিতে পারি জান? আমি এখনই রম্পিকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি।

পরমেশ দেখলেন বিপদ। রমার বাবা, মানে তাঁর শ্বশুরমশায়, জাঁদরেল উকিল। রমা বাপের বাড়ি গেলে ৪৯৮ তো পরের কথা তার ডান হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। খাবেন কোথায়? অগত্যা আবার সুর নরম করতেই হলো।

আরে রাগ করছ কেন। দীক্ষা না কী যেন বলছিলে। সে সব নিলে তো শুনেছি নিরামিষ খেতে হবে, ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টনাম জপতে হবে, আর কী সব যেন করতে হবে।

করতে হলে করবে। প্রথম এক বছর শনি - মঙ্গল নিরামিষ, তাও একবেলা। আর ত্রি-সন্ধ্যা ইষ্টনাম জপ।

অত সময় কোথা আমার?

ত্রি-সন্ধ্যা অপিসের ছুঁড়িগুলোর নাম জপতে সময় পাও আর ঠাকুরের নাম নিতে পারবেনা।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। এবার পরমেশ নীরবে হজম করলেন। শ্বশুরের মেয়েকে চটানো উচিত হবে না। তাও যে সে শ্বশুর নয়, উকিল শ্বশুর। ওদের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। অফিসে বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছেন, গিন্নি বললেন, শোন, আরতির বাড়ি আজ সন্ধ্যায় ভজন হবে। তুমি অপিস ফেরত ওখানে চলে যেও। আর হ্যাঁ, আসার সময় কিছু মালা আর কেজি খানেক রাবড়ি নিয়ে আসবে। আজ গুরুদেবের জন্মদিন।

পরমেশের মাথায় যেন বাজ পড়লো। আজ সন্ধ্যায় শোয়ে নন্দনে ফিল্ম-ফেস্টের একটা হট ছবি দেখার টিকিট যোগাড় করেছেন। আমেরিকান এই ছবিটায় কয়েকটা দারুন সিন আছে। একটাই শো, কোন মতেই মিস করা যায় না। সুর খুব নরম করে পরমেশ বললেন, চেষ্টা করে দেখব, কথা দিতে পারছিনা। আজ অফিসে ছুটির পর ইউনিয়নের জরুরি মিটিং আছে। চলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কথা কটা বলে, রমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই একরকম দৌড়ে বেরিয়ে এলেন পরমেশ। কোথায় ফাটাফাটি সিনেমা দেখবেন না সেসব ছেড়ে শালির বাড়ি ভজন। একবার গিয়ে এত বোর হয়েছিলেন যে বলার নয়। জীবনটা নিরামিষ করে দেবে সবাই মিলে। কেন রে বাপু, আমি তো কারও পাকা ধানে মই দিইনি। তবে কেন আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? এটা কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। পরমেশ মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা করেন।

শো এর কিছু আগেই নন্দনে পৌছলেন। ভিড়ে থিকথিক করছে। সবই অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে, জোড়ায় জোড়ায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে পরমেশ অপেক্ষা করতে লাগলেন ভীড়টা একটু হাল্কা হওয়ার জন্য। এক একা এসব সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না। কিন্তু কাউকে পেলেনও না। অফিসে আজ দীপা আসেনি। বোঝা গেল না সকালে বাড়িতে ফোন করেছিল কেন। আর যে জন্যই করুক রমা ওকে এমন কথা শুনিয়েছে যে পরমেশকে লজ্জায় পড়তে হবে। রমার দিন দিন যে কী হচ্ছে। ডাক্তার মিশ্র অবশ্য বলেছেন 'পোস্ট মেনপজাল প্রবলেম'। একটু মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে। তিনি না হয় বুঝলেন, কিন্তু বাইরের লোক কী এত সব বুঝবে, না বোঝান যাবে। রমার জন্য তো তিনি বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের ডাকতেও সাহস পান না। অফিসের যত ফ্যামিলি ট্যুর হয় পরমেশ একাই যান। মেয়েটাকে নিয়ে যেতে চাইলেও রমার আপত্তি। পরমেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। ভিড়ের মধ্যে দেখতে পান দীপা একটা ছেলের সঙ্গে হাসতে হাসতে হলে ঢুকছে। তবে কী এক্সট্রা টিকিটের জন্যই দীপা ফোন করেছিল। হতে পারে, কদিন আগে টিকিটের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিল বটে। পাছে দীপার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই তিনি একটু আড়ালে সরে যান। এদিকে শো এর সময় হয়ে আসে। পরমেশ ঘন ঘন সিগারেটে টান দেন। এমন উজ্জ্বল সন্ধ্যায় সুবেশ তরুণ-তরুণীর ভিড়ে পরমেশের কানে বেজে ওঠে শালির বাড়ি গুরুদেবের ভজন - 'জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে .....' সঙ্গে খোল, করতাল আর সমবেত ভক্তগণের অর্ধ-নিমীলিত চোখে উদ্বাহু হয়ে দুলে দুলে সুরে সুর মেলানোর ছবি।

কাকু, এক্সট্রা হবে? একটা, যা লাগে ....

কাকু! অল্পবয়সী ছেলেটা করুণ মুখে চেয়ে। সঙ্গের মেয়েটি রম্পির বয়সীই হবে। তার নীরব দৃষ্টিতেও আর্তি। পরমেশ একবার ভাবলেন টিকিটটা ওদের দিয়েই দেন। ওরা অন্তত দুজনে মিলে এনজয় করুক। এই অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের পাশে বসে একা একা এই ছবি দেখাটা ভাল হবে না।

হবে না, না? এবার মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো। তারপর পরমেশের কাছে টিকিট নেই ধরে নিয়ে ওরা চলে গেল। একটা সময় পরমেশ দেখলেন তিনি একা পায়চারি করছেন নন্দন চত্বরে। প্রায় সবাই যখন ঢুকে গেছে তখন অন্ধকারে তিনি হলে ঢুকে পড়লেন।

৩

ছবি শুরু হয়েগেছে। একটা সারির মাঝামাঝি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে যাবার পথে নানারকম কটুকাটব্য করছে লোকে। নিজের আসনে বসে পরমেশের মনে হলো 'হংস মধ্যে বক যথা'। সামনে, পিছনে, পাশে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের ভিড়। হলের মধ্যে উসখুস উসখুস। হঠাৎ পিছনে বসা মেয়েদের কাউকে বলতে শোনা গেল, এই দ্যাখ সামনের ঐ লোকটাকে আমাদের রম্পির বাবার মত দেখতে না? অন্ধকারে ভাল করে .....।

ছবি জমে উঠেছে, হলের মধ্যে উত্তেজনা প্রবল। পরমেশ আর ছবিতে মন দিতে পারছেন না। রম্পির কলেজের বন্ধুরা যদি

এ ছবি দেখতে আসে তাহলে আর রক্ষে নেই। প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি। অন্ধকার চোখ সয়ে গেছে। তাঁর পাশে বসা ছেলেটিই তো তাঁর কাছ থেকে টিকিট চেয়েছিল। পরমেশের মনে হল ব্যাটম্যানের মত যদি এই মুহূর্তে হলের বাইরে উড়ে যেতে পারতেন তো ভাল হত।

আর না, অনেক হয়েছে। বেরিয়ে পড়ার জন্য পরমেশ উঠে দাঁড়ালেন।

পরমেশ ভাবলেন আর এক মুহূর্ত নয়। এই অন্ধকারে চলে গেলে কেউ লক্ষ্য করবে না, সবার চোখ পর্দায়। উঠেই দাঁড়ালেন পরমেশ। পাশে, পিছনের লোকেরা অশ্রাব্য কটুকাটব্য অগ্রাহ্য করে পরমেশ বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

৪

বাসে উঠেই দেখলেন ভুল বাসে উঠেছেন। যাবেন টালায়, উঠেছেন ঢাকুরিয়ার বাসে। মালা আর রাবড়ি নিয়ে শালির বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবাই যায়না। ঘড়ি দেখলেন। সবে সাতটা। হঠাৎ মনে পড়লো কলেজের সহপাঠি ভবেশের কথা। ওদিকেই থাকে, বহুদিন যোগাযোগ নেই। ওর বাড়িতেই ঢুঁ মারা যাক।

বাড়ি চিনতে একটু অসুবিধে হল, গত সাত-আট বছরে এ পাড়াটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলিং বেল বাজাতেই মিনু দরজা খুলে ... আরে পরমেশদা যে কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন। রমাদিকে আনেননি।

না, এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, তাই ভাবলাম ...। ভবা ফেরেনি?

ফিরেছে। আসছে, বসুন আপনি। চা বসাই?

ভবা আসুক না, একসঙ্গে না হয় .....

ওর এখনো ঘন্টা খানেক দেরী। ততক্ষণ চা খান, ও এলে জল-খাবার দেব। বসুন।

ছেলে, কোথায়? কী করছে এখন?

বাবু পার্ট টু দিচ্ছে এবার, কলেজ করে টিউশন সেরে বাড়ি ফিরতে ন'টা। রম্পির খবর কী?

ও তো পার্ট ওয়ান দিয়েছে।

বাব্বা, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। এইতো সেদিন অন্নপ্রাশন খেয়ে এলাম।

আমরাই বুড়িয়ে গেলাম।

পরমেশ এবার মিনুর দিকে তাকালেন। তারপর ঈষৎ হেসে বললেন, একটু বেশি বিনয় হয়ে যাচ্ছে না।

কেন, বিনয় বলছেন কেন?

আপনার চেহারায় বিন্দুমাত্র বয়সের ছাপ পড়েনি। তার উপর আপনি ছেলের মা। ছেলের মায়ের বয়স বাড়েনা। মেয়ের মা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়।

বলছেন?

পরমেশ শুধু চোখ বুজে হাসিমুখে ঘাড় নাড়লেন।

রমাদির খবর কি?

ঐ, আছে একরকম।

আছে একরকম মানে?

মানে এই বয়সে যেমন সব থাকে আর কি। পুজো আচ্চা, ভজন কীর্তন, গুরুদেব- এসব নিয়েই সময় কাটায়। ভীষণ বাতিকগ্রস্ত হয়েছে।

যাই বলুন পরমেশদা, চেহারাটা কিন্তু একই রকম রেখেছেন। দেখলে বোঝাই যায় না, আপনি পঞ্চাশ পার করেছেন। আপনার বন্ধু তো এখনই বুড়ো হয়ে গেছে। মাথাজোড়া টাক, শখ-আহ্লাদের বালাই নেই।

সোফায় হেলান দিয়ে পরমেশ বলেন, অধ্যাপক মানুষ তো। পড়া আর পড়ান নিয়েই থাকতে ভালবাসে।

সেটা হলেও তো কথা ছিল। এখন নতুন উপসর্গ জুটেছে -- ধ্যান। একটা সাধুবাবার চেলা হয়েছে ইদানিং। ঐ যে দেখছেন না তার ছবি। দেওয়ালে ঝোলান। বাঁধান ছবিটার দিকে পরমেশ হাঁ করে তাকিয়ে দেখেন। ভাবেন শেষে ভবাও এসব শুরু করে দিয়েছে।

আপনি ভবাকে কিছু বলেন না?

বললে বলে, সেকালে এই বয়সে লোকে বাণপ্রস্থে যেত। নেহাত বিয়েটা দেরিতে হয়েছে ছেলেটা উপযুক্ত হয়নি তাই চাকরি বাকরি করা। এখন থেকেই মন তৈরি কর। বসুন একটু, চায়ের জলটা চড়িয়ে আসছি।

মিনুর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করছিলেন পরমেশ। রমারই বয়সী হবে। অথচ শরীরের বাঁধুনি কেমন আঁটোসাঁটো, চোখেমুখে কেমন দীপ্তি। ঘরে আলমারি ভর্তি ঠাসা বই। গীতা, উপনিষদ, কথামৃত আর কত সব। ভবা এসব পড়ে কখন? তাঁর তো পড়ার নামে ঘুম আসে, দিনের কাগজটাও দিনে শেষ করতে পারেন না।

রান্নাঘর থেকে কাপ-প্লেটের টুকরো শব্দ আসছে। পরমেশ উসখুশ করছেন। ভবা এতক্ষণ করছেই বা কী? সত্যি বলতে কি

বন্ধুর চেয়ে বন্ধুপত্নীর সান্নিধ্য পেতেই পরমেশ বেশি উৎসাহী। সময় কাটাতে সেন্টার টেবিলে রাখা কাগজটা টেনে রাশিফলে চোখ রাখেন।

ইশশশ, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম আপনাকে, আসলে পকোড়াগুলো ভাজতে ... মিনুকে এক ঝলক দেখেই পরমেশ আবার কাগজে চোখ নামালেন। এটুকু সময়ের মধ্যে শাড়ি বদলে, মুখে হালকা প্রসাধনের ছোঁয়া লাগিয়েছে। শাড়িটা কি একটু নামিয়ে পরেছে?

অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন? মিনুর চোখে কৌতুক।

রাশিফল।

কী রাশি আপনার। প্রসাধনের সুগন্ধ নিয়ে মিনু পরমেশের পাশে বসলো।

বৃষরাশি, কাগজে চোখ রেখেই বললেন পরমেশ।

লগ্ন?

অত্ত সব জানিনা।

জানলে ভাল হতো। দেখি আপনার রাশিফলে কী লেখা আছে। কাগজটা টেনে নিয়ে মিনু পড়তে থাকে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, অর্থাগম, পত্নী ও গুরুজনের পরামর্শলাভ, সন্তানের স্বাস্থ্যের উন্নতি ... কি মিলছে? মিনুর সম্মোহনী দৃষ্টিতে কৌতুক। ঘামে ভেজা কপালে কুঁচো চুল জড়িয়ে আছে। ভ্রূ যুগলের মাঝে ছোট লাল টিপ, গলার ভাঁজে ভেজা পাউডারের ছোপ।

কী দেখছেন? বললেন না তো মিলল কি না?

পরমেশ অপ্রস্তুত। বললেন কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির একটা খবর আছে বটে। আর পদোন্নতি হলে অর্থাগম হবে এবং সেটা সদুপায়ে, সেটা বলাইবাহুল্য। মেয়েটা ম্যালেরিয়া থেকে সদ্য সেরেও উঠেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে পত্নী ও গুরুজনের পরামর্শলাভ না কী যেন বললেন তাই নিয়ে।

কেন?

রমা তো আমায় সবসময়েই পরামর্শ দিতে ব্যস্ত। আর শ্বশুরমশায়? তাঁর ধারণা আমার মত বোকা - হাঁদা পৃথিবীতে দুটি নেই। দেখলেই উপদেশ।

জামাতা সম্পর্কে সব শ্বশুরমশাইরা ঐ একই কথা বলেন। এ আর নতুন কী? মিনু এবার আমাদের জল-খাবারের ব্যবস্থা কর। বল পরা, আছিস কেমন। এতদিন পর বন্ধুকে মনে পড়ল?

তুই তার আগে বল কী করছিলি এতক্ষণ? আমি এসেছি ... হ্যাঁ তা প্রায় মিনিট কুড়ি তো হল।

কেন, মিনু কিছু বলেনি?

না। বুঝেছি, বাথরুমে ছিলি। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছিস তো?

কোষ্ঠকাঠিন্য, হা হা। তা ধরেছিস ঠিক। তবে তুই যেটা ভেবেছিস সেটা নয়।

মানে? কোষ্ঠকাঠিন্যের আবার রকমফের হয় নাকি?

আমি বলতে চাইছি মনের কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা। ওটা দূর করার জন্য রোজ একটু মুখোমুখি হই নিজের।

ভবা, সোজা কথাটা বেঁকিয়ে বলা তোর চিরকালের স্বভাব। তোরা মনে করিস পৃথিবীর সবাই তোদের পাঠশালার ছাত্র, আর তাদের ধরে ধরে জ্ঞান দেওয়াটা তোদের বার্থরাইট।

পরা, তোদেরও দোষ হচ্ছে মাথাটা চিরকাল দেহের উপরে বসিয়েই রাখলি। ওটা খেলানোর চেষ্টা করলি না। আরে বাবা, শরীরের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে যেমন গ্যাস, অম্বল, বদহজম এসবের সমস্যা, মনের কোষ্ঠ পরিস্কার না হলে মানসিক অশান্তি। যাক ওসব কথা। বল, আসছিস কোথা থেকে, অফিস থেকে নিশ্চয়ই।

পরমেশ ঈষৎ গলা নামিয়ে এদিক ওদিক দেখে বললেন, গেছিলাম তো নন্দনে ফিল্ম ফেস্টের ছবি দেখতে। আমেরিকান ছবি, বুঝলি। সুপারহিট ছবি। কিন্তু উঠে আসতে হল।

কেন, কেন? উঠে আসতে হল কেন?

ওঃ জোড়ায় জোড়ায় গেছে সব। কী কান্ড যে করছিল, ছবি দেখবো না ওদের কান্ড দেখবো। মাইরি।

ওই বয়সে তুইও করেছিলি। এখন ওদের সময়, ওরা করছে।

আমরা ওদের মত এতটা নির্লজ্জ ছিলাম না। এটা তো মানবি, নাকি?

যুগ বদলাচ্ছে, পাশ্চাত্য প্রভাব এসে পড়ছে। ঠেকাবি কী করে।

কী ঠেকানোর কথা বলচো পরমেশদাকে। খাবারের ট্রে নিয়ে মিনু ঢুকল।

পরমেশ তাড়াতাড়ি বললেন ওই ম্যালেরিয়ার কথা হচ্ছিল। আমি বলছিলাম ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এখন ঘরে ঘরে। তাই ভবা বলছিল ওসব হলে ঠেকাবি কি করে।

ভবেশ হো হো করে হেসে হাসতে হাসতে খাবারের ট্রে টেনে নিলেন।

মিনু বলল, ঠান্ডা হওয়ার আগে শুরু করুন, চা বসিয়েছি।

পরমেশের সামনে পরিপাটি করে লুচি, তরকারি, মিষ্টি আলাদা

প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছেন মিনু। এমন যত্ন সে বাড়িতে ইদানিংকালে পেয়েছে বলে মনে পড়েনা। গৃহদেবতার প্রতি রমার যত্ন, পতিদেবতার প্রতি তার ছিটেফোঁটাও যদি থাকতো। কপাল, সবই কপাল। আবার ধরেছে দীক্ষা নিতে হবে। খানকতক ভাজা লুচি অন্য একটা প্লেটে নিয়ে মিনু এবার বসলেন পরমেশের পাশেই। পরমেশ লুচিতে তরকারি নিয়ে মুখে দেন। আঙ্গুলের মাথাগুলো পরম তৃপ্তিতে চেটে নিয়ে বলেন, মোচার ডালনাটা চমৎকার হয়েছে, কী বলিস ভবা?

খাওয়ার কথা খাই, অত ভাল-মন্দ বুঝি না। তা তুই আছিস কেমন বল।

তৃতীয় লুচিটা মুখে পুরতে পুরতে পরমেশ বলেন, দিব্বি। সুগার নেই, প্রেশার, কোলেস্টেরাল নর্মাল, খেয়ে হজম হয়, এক ঘুমে রাত কাবার। আর কী চাই। এক মেয়ে, বিয়ে দিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যাবে। ব্যাস।

আর একটু ডালনা দেব আপনাকে।

দেবেন, দিন। দ্যাখো, দ্যাখো আবার লুচি কেন। রাতের খাওয়ার .....।

রাতের খাওয়াটা এখানেই সেরে যা। মিনু আমাকে খাইয়ে সুখ পায়না। পরা বেশ ভোজনরসিক আছে তাই না মিনু?

তোমার মত অন্তত নন। জানেন পরমেশদা, সেদিন ফুলকপির তরকারিতে নুন দিতে ভুলে গেছিলাম। কেমন হয়েছে বলাতে বলল, ভালই তো। আমি সে তরকারি মুখেই তুলতে পারিনি। বিস্বাদ, আলোনো।

বাঁচার জন্য খাওয়া না খাওয়ার জন্য বাঁচা - কোনটা ঠিক বলে মনে করিস পরা?

খাওয়া শেষ করতে করতে পরমেশ বলেন, আমার মনে হয় খাওয়ার জন্যই বাঁচা। জগতে কত কিছু চব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় আছে। সেসব খাও, ফুর্তি কর।

তুই ঠিক আগের মতই আছিস পরা। আচ্ছা, মহিলাদের ব্যাপারে তোর ইনফ্যাচুয়েশন এখনো আছে? মানে মহিলা দেখলেই তো চোখমুখের .....

ধ্যাত, কী যে বলিস। মিনুর সামনে এই প্রসঙ্গ তোলায় পরমেশ ভবার ওপর বেশ চটে যায়।

মিনু বললেন, তা পরমেশদার যা চেহারা, এই বয়েসেও যা স্মার্ট, মেয়েরা এ্যাট্রাকটেড হবেই। আমি মেয়ে হয়েও বলছি।

পরা, মিনু কী বলে রে।

এতে বলাবলির কী আছে? জামা কাপড়ের চয়েসটা দেখ। হালকা কালারের চেক শার্টের সঙ্গে ডীপ কালারের ট্রাউশারস, মানানসই স্যু, বেল্ট। একটা চুলেও পাক ধরেনি। সবাই কী তোমার মত। কেবল জপ, ধ্যান আর গুরুদেব। না শখ, না আহ্লাদ। কতদিন সিনেমা থিয়েটার নিয়ে যাও নি বলতো?

থিয়েটার, সে তো কবেই উঠে গেছে। আর সিনেমা? পরাকে জিজ্ঞেস কর .....

না, বৌদি এখনকার সিনেমা, হলে বসে দেখার নয়। তা ওই জপ, ধ্যান না কী যেন বলছিলেন? পরমেশ তাড়াতাড়ি সিনেমা প্রসঙ্গ পালটায়। ভবাকে বিশ্বাস নেই।

কী আর বলব। সকালে ওরা দুজনে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায়। সারাদিন একা থাকা। আপনার বন্ধু সন্ধ্যেবেলা যদিও ফিরল তো চোখ বুজে ধ্যানে বসে পড়ল। ছেলের ফিরতে ফিরতে কোনদিন ন'টা কোনদিন তারও বেশি। এভাবে ভাল্লাগে বলুন, দিনের পর দিন।

সে তো ঠিকই। বেড়াতে যান না কেন মাঝে মাঝে?

বেড়াতে? একলা একলা যাওয়ার হলে যেতাম।

'একলা' ওই কথাটাতেই তো আমার আপত্তি, মিনু। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই একলা। এই পারস্পরিক সম্পর্ক, সংসার এসবই মায়ার বন্ধন। কেউ কারো নয়।

ভবা, তুই এসব কী বলছিস রে। তুই না ফিজিক্সের টিচার? ফিজিক্সে এসব কথা বলে নাকি?

ফিজিক্স বস্তু জগত নিয়ে কারবার করে। কিন্তু তার বাইরেও এক বিশাল জগত আছে, সেটার নাগাল পেতে হয় অনুভবের মাধ্যমে। আর তার জন্যই ধ্যান, বুঝেছিস?

আর বুঝে কাজ নেই। মিনু ফোঁস করে ওঠে। দেখুন না পরমেশদা আজকাল কিছু বললেই এসব আবোল তাবোল কথা বলে।

আবোল তাবোল নয় মিনু। এই সংসার, স্ত্রী, পুত্র, মা, বাবা কেউ কারো নয়। সব মায়ার বন্ধন। এই বন্ধন কাটাতে না পারলে

তার মানে বউ ছেলের প্রতি তো কোন কর্তব্য নেই বলতে চাস? তোর বিয়ে সাদি না করাই উচিত ছিল।

কর্তব্যের গাফিলতি করেছি এমন দোষারোপ মিনু বা বাবু করতে পারবে? কথার মাঝে মিনু উঠে যান চা আনতে।

দেখ ভবা, রমা আমাকে দীক্ষা নেবার জন্য পীড়াপিড়ি করছে। আমার একদম ইচ্ছে নয়। কি করি বলতো?

ইচ্ছা না হলে নিস না। এসব জোর করে হয় না।

দীক্ষা নিলে, ধ্যান করলে কী হয় রে, ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়?

চিত্তশুদ্ধি হয়, আত্মদর্শন হয়। তাকেই যদি ভগবৎদর্শন বলিস তো তাই।

ভবার কথাগুলো পরমেশের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। একী ঝামেলায় পড়া গেলরে বাবা। এখানেও ধ্যান জপের কথা। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি কে জানে?

তুমি থামাবে তোমার লেকচার। মিনু চা নিয়ে ঢোকেন। কোথায় একটু অন্য কথা হবে তা নয় .....

আচ্ছা বাবা, তোমরা কথা বল, আমি একটা ফোন করে আসছি। ভবা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ টের পেলেন ঘরের ভারি বাতাসটা একটু যেন হালকা হল। মিনু এসে এবার বসলেন পরমেশের গা ঘেঁসে। কতদিন বেড়াতে যাওয়া হয়না, চলুন না কোথাও যাই কদিনের জন্য। আপনি রমাদিকে রাজি করান, আমি ওকে রাজি করাচ্ছি।

বাইরে কলিং বেল বাজলো। ঘরে যে ঢোকে তাকে দেখেই পরমেশ চমকে ওঠে। এইতো এক্সটা টিকিট চাইতে এসেছিল।

বাবু, চিনতে পারছিস, পরমেশ কাকু, প্রণাম কর।

ছেলেটি পরমেশের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামায়। প্রণাম করতে যায়।

থাক, থাক। কি নাম যেন তোমার?

পার্থ, আমি চেঞ্জ করে আসছি কাকু, বসুন।

না। আমি এবার উঠবো। প্লেটে গরম চা টা ঢেলে ফুঁ দিয়ে এক চুমুকে শেষ করেই উঠে দাঁড়ালো পরমেশ এবং এক লাফে দরজার বাইরে। বৌদি, ভবাকে বলে দেবেন পরে যোগাযোগ করে নেবো।

পরমেশের এহেন তাড়ার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে মিনু অবাক হয়ে যান। আবার আসবেন বলতে গিয়ে দেখেন পরমেশ ততক্ষণে রাস্তায়।

পার্থ নিশ্চয় তাঁকে চিনতে পারেনি। আর যদি চিনেই থাকে তো ক্ষতি কী। তিনি যে সিনেমা দেখতেই ওখানে গিয়েছিল তা তো প্রমাণ হয়নি। বরং পার্থই ভাববে আমি যদি ওদের প্রেমের কথা বাড়িতে বলে দিই। এবার পরমেশ খানিক স্বস্তিবোধ করলেন। ঘাম মুছতে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন রুমালটা ফেলে এসেছেন ভবার বাড়ি।

৫

খুব ধূমধাম করে পরমেশের দীক্ষা হয়ে গেল। সেদিনের পর পরমেশ যেন মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরমেশ নিজেও বুঝেছেন মনের উল্টোপাল্টা চিন্তা নিয়ন্ত্রণ না করলে সমাজে বেইজ্জত হতে হবে। আর তার জন্য ধ্যানই একমাত্র উপায়। আর এতে ঘরের শান্তিও বজায় থাকবে। রমা তাঁকে সন্দেহ করবেনা। আর বাইরে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারবেন। এসব ভেবে দীক্ষায় আর বিশেষ আপত্তি করেননি। গুরুদেব পরমেশের কানে বীজমন্ত্র দিয়ে আগামী একমাস সন্ধ্যায় ধ্যানে বসতেই হবে, এমন আদেশ দিলেন। তারপর থেকে দিনের যে কোন সময়ে ধ্যান করলেই চলবে। এই একমাস খাদ্যখাদ্যের কিছু বিধিনিষেধ মানতে হবে। রমা খুব খুশি। সে ভীষণ যত্নআত্তি করতে শুরু করেছে পরমেশের। লাভের লাভ এটাই।

পরের দিন সন্ধ্যায় পরমেশ প্রথম ধ্যানে বসলেন। ঠাকুরঘর অন্ধকার। ধূপ জ্বলছে। পিলসুজের ওপর একটা প্রদীপ। তার শিখা স্থির। রমা একটা কম্বলের আসন, পাটেরধুতি কিনে এনেছেন। সেই ধুতি পরে, আসনে বসে চোখ বুজলেন পরমেশ। গুরুদেব একমনে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলেছেন। চোখ বুজে প্রদীপের শিখা দেখতে বলেছেন। কিছুক্ষণ বসার পরেই কানের কাছে ভোঁ ভোঁ মশার রেওয়াজ শুরু হয়েগেল। চটাস, চটাস শব্দে হাত চালালেন। পাশের বাড়ি থেকে তার প্রিয় টিভি সিরিয়ালের কথা ভেসে আসছে। আজই তো ভিলেন ধরা পড়ার কথা। কি হল কে জানে। একটু যেন খিদেও পাচ্ছে। বন্ধ দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ। রমা কি পাহারা দিচ্ছে? খানিকবাদে পরমেশ দেখলেন তিনি বসে আছেন ঠিকই কিন্তু মন্ত্র বলছেন না। সময়ের আগে বেরনো যাবেনা, রমা ধরবে।

এরপর পরমেশ জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে, প্রাণপণে চোখ বুজে প্রদীপের শিখা দেখার চেষ্টা করলেন। পারতেই হবে তাঁকে। খানিক বাদে মন্ত্র বলা থেমে গেল, প্রদীপের শিখা আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল। পরমেশ দেখলেন মিনুর মুখ আর বুকের ওপর সোনার চেনে ঝোলানো ছোট্ট পেনড্যান্ট চিক চিক করছে।

কাছেপিঠের ছয় ভ্রমণ

সুজয় বাগচী

পরিযায়ী মন আর থাকতে চাইছে না বাঁধনে ? চলুন বেড়িয়ে আসি, সীমানা ছাড়িয়ে, কিন্তু নাগালের মধ্যে।

রাবাংলা ঃ মৈনাম আর তেনডং পাহাড়ের মাঝে সিকিমের ছোট্ট একটা জনপদ। সামান্য খরচা অসামান্য জায়গা। দুদিন হলেই হয়ে যাবে। কি পাবেন ? অসংখ্য নাম না জানা ফুল, অসংখ্য পাখী আর নীল আকাশের নীচে সবুজ পাহাড়ের সারি। মাঝে শুভ্র চাদর গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

কীভাবে যাবেন ঃ হাওড়া / শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে এন.জি.পি.। এন.জি.পি. থেকে অটো (১০ টাকা করে) তেনজিং নোরগে বাস স্টপ। তারপর সেখান থেকে বাসে (১৩৫ টাকা) বা জিপে (২২৫ টাকা) বা পুরো গাড়ি (২০০০ টাকা ১০ জনের জন্য) যেতে হবে নামচি (৯০ কি.মি.) ওখান থেকে বাসে (৩৫ টাকা) / জিপে (৬০টাকা) রাবাংলা (২৬ কিমি)।

কি দেখবেন ঃ টেমি টি গার্ডেন, তেনডিং হিল, মৈনাম ওয়াইল্ড লাইফ সাংচুয়ারী, (প্রায় ১৩৫ ফুট উঁচু, টিকিট ৫০ টাকা) । রক গার্ডেন, আর নামচিতে চারধাম (টিকিট ৫০ টাকা)।

কোথায় থাকবেন ঃ নানা মানের হোটেল আছে। ডাবল বেড (৮০০, ১০০০, ১২০০, ১৪০০ টাকা) হোটেল রিগ্যাল।

খাবার ঃ নিরামিষ থালা ১০০টাকা, আমিষ থালা ১৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেন ধরুন শুক্রবার রাবাংলায় পৌঁছানোর পর পায়ে হেঁটে ঘুরুন। শনিবার গাড়ি (১৫০০ টাকা চারজনের জন্য) নিয়ে আশপাস ঘুরে নিন। রবিবার সকাল ৭টার বাসে শিলিগুড়ি চলে আসুন, রাতে ট্রেনে ফিরে আসুন।

জটার দেউল ঃ কাক ভোরে বাস ধরে শিয়ালদহ। তারপর লক্ষীকান্তপুর লোকালে চড়ে বসলাম। গন্তব্য মথুরাপুর। বাঘাযতীন থেকে উঠল রঞ্জিত। রবিবারের সকাল, ট্রেন একটু ফাঁকা। প্রায় ৫০ কিমি রাস্তা। মথুরাপুর নেমে সামান্য খেয়ে নিলাম। এবার যাব রায়দিঘি। ২০ কিমি যেতে ৪৫ মিনিট মতো সময় লাগে। আমরা দুজন। ড্রাইভার দাদা জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাবেন ? বললাম 'জটার দেউল'। জানেন তো দেউলের অনেক ইতিহাস আছে। আগে ওখানে গাইডের কাজ করতাম। অতি সামান্য আয় ঠিকঠাক চলত না। তাই এখন অটো চালাই। অটো দাঁড় করিয়ে বলতে লাগলেন 'রায়দিঘি, রায়দিঘি'। আমি বললাম দাদা আর লোক তুলবেন না, পুরো টাকাটা আমরা দেব। আপনি ইতিহাসটা বলুন ...। শুরু করলেন .... 'অনেকে বলেন এই দেউল নাকি রাজা প্রতাপাদিত্যের কোন যুদ্ধে জয়ের স্তম্ভ। এর উচ্চতা ৭০ ফুট। অনেকে আবার বলেন এখানে জটাধারী নরখাদক বাঘ আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য এই নাম। আবার কেউ কেউ বলেন এই মন্দির এর আরাধ্য দেবতা জটাধারী শিব তাই এই নাম। রায়দিঘী থানার অন্তর্গত ১১৬ নম্বর লটে এটি দাঁড়িয়ে। এই মন্দিরের মাথায় অনেক মনিমাণিক্য ছিল। ১২৭৪ সালে স্মিথ সাহেব এই অঞ্চলে আসেন, ভাবেন দেউলের মাথায় গুপ্তধন আছে, তিনি মাথাটা ভেঙে দেন।' অটো র‍্যাস্তার ধারে দাঁড়াল। আমার থেকে টাকা নিয়ে তেল নিল। আবার চলা এবং বলা শুরু .... 'প্রত্নত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় এই দেউল-এর উল্লেখ আছে। প্রত্নত্ত্ববিদ হান্টার সাহেব বলেছেন এটা নাকি বৌদ্ধ মঠ। ১৮৭৫ সালে এই অঞ্চলের জমিদার দূর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী পুষ্করিণী খননের সময় একটা তামার ফলক পান। তা থেকে জানা যায় জয়ন্ত চন্দ্র নামে এক রাজা ৯৭৫ খ্রিঃ এই দেউল নির্মাণ করেন।' রাস্তা নয় যেন মাখন। অটো ছুটে চলেছে। নির্মলবাবু মানে ড্রাইভার দাদা আবার শুরু করলেন, 'ঠিক একই রকমের দেউল কুলতলিতেও আছে। ২৬শে চৈত্র থেকে ২রা বৈশাখ মেলা বসে। এখানে ঘোড়া দৌড়ও হয়।' অটো একটা ব্রীজের উপরে উঠল। অসাধারণ একটা নদী। দাদা নদীর নাম কী ? বললেন, 'মনি নদী। আগে খেয়া ছিল। ২০০৯ এ ব্রীজটা তৈরী হয়।' আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম। চোখ জড়ানো স্থাপত্য। মন ভরে গেল। আট কোণ বিশিষ্ট দেউল। একটি মাত্র দরজা, সাড়ে ন'ফুট উঁচু। ছ'ফুট নিচুতে গর্ভগৃহ। ছটা সিঁড়ি। আর কোন দরজা জানালা নেই। স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান আর খ্রিস্টান - নিজেরা মিলে একটা দেউল রক্ষা কমিটি তৈরি করেছে। পারলে একটা রবিবার ঘুরে নিন।

গনগনি ঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে 'Grand Canyon of West Bengal' আছে। হ্যাঁ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রান্ড ক্যানিয়ন দেখার ইচ্ছায় আমি আর দেবা রবিবারের টিকিট কেটে চেপে বসলাম রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে, গন্তব্য গনগনি। নামলাম গড়বেতা। স্টেশন থেকে গনগনি ৪.২ কি.মি.। গড়বেতা

স্টেশনের কাছেই কিছু হোটেল আছে।

সূর্যের আলোয় ক্যানিয়ন এর ল্যাটেরাইটগুলো যেন সোনার মতো চকচক করছে। নিচ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে শিলাবতী। দুপাশে আছে কাজুর বন। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে লাল মাটির রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে গনগনির ক্যানিয়ন-এর দিকে।

গনগনিকে দেখেই বুঝলাম কেন এটিকে Mini Grand Canyon বা Grand Canyon of West Bengal বলা হয়। ৭০ ফুট গভীর এই খাদ বা ক্যানিয়ন। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে শিলাবতী। প্রাকৃতিক নিয়মে বছরের পর বছর ধরে ভূমিক্ষয় এবং শিলাবতীর ছোঁয়ায় জন্ম নিয়েছে এই ক্যানিয়ন। খাদের গায়ে যেন কোনো বিখ্যাত শিল্পী ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে ভাস্কর্য খোদাই করেছেন পাথরের গায়ে। ল্যাটেরাইট পাথরের ওপর যেভাবে ফুটে উটেছে এই 'মাস্টারপিস', তাতে সত্যি এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে এগুলো প্রাকৃতিক ভাবেই নিজে থেকে তৈরী হয়েছে। ক্যানভাসে আঁকা পট Grand Canyon।

আমাদের টোটোর ড্রাইভার রিন্টু বলল, 'লোকমুখে প্রচলিত একটি ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের শিকড় পৌরাণিক যুগে মহাভারত অব্দি বিস্তৃত। পান্ডবরা বনবাসে থাকা কালিন এসে পড়েছিলেন এই গনগনিতে। এই তল্লাটে তখন দাপিয়ে বেড়াত বকাসুর নামে এক রাক্ষস। কোনো একজন গ্রামবাসীকে রোজ তার হাতে তুলে দিতে হত নৈবেদ্য হিসেবে। এর অন্যথা হলে, সমস্ত গ্রাম তছনছ করে ছাড়তো বকাসুর। পান্ডবরা এইখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। বকাসুরের খাদ্য হিসেবে উৎসর্গ হওয়ার জন্য একদিন সময় এলো এই পরিবারের। মাতা কুন্তীর নির্দেশে ভীম ওই পরিবারের সদস্য হয়ে নিবেদিত হলো বকাসুরের কাছে। শুরু হল প্রবল যুদ্ধ বকাসুরের সাথে শক্তিশালী ভীমের। অবশেষে ভীমের হাতেই বধ হল বকাসুর। তাদের যুদ্ধের প্রতাপে এখানকার মাটি কেঁপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর তার থেকেই এই অদ্ভুত গনগনির ক্যানিয়ন এর সৃষ্টি।' বৈজ্ঞানিক না পৌরাণিক কোন দিক দিয়ে গনগনির উৎস বিচার করবেন তা আপনার উপরে ছাড়লাম। ক্যছেই একটি জাগ্রত মন্দির আছে — সর্ব্বমঙ্গলা মাতা ঠাকুরানি'র, অবশ্যই যাবেন।

কিভাবে যাবেন ঃ গড়বেতা যাবার জন্য হাওড়া থেকে বহু ট্রেন আছে রূপসীবাংলা, আরণ্যক, রাজ্যরাণী, লালমাটি: গড়বেতা নামতে হবে। গড়বেতা থেকে টোটো বা অটো। মাথা পিছু ৬০ টাকা আর পার্কিং ৩০ টাকা।

সাত দেউল বা সপ্ত দেউল ঃ মেমারী স্টেশনে নেমে টোটো ধরলাম। গন্তব্য আঝারপুর। নিহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে এই আঝারপুরের উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ঋক বেদের অনুবাদক রমেশ চন্দ্র দত্তের জন্ম এই আঝারপুরে। মেডিকেল কলেজের এক কৃতী ছাত্র ডাঃ নরেন্দ্র মিত্র-র জন্মস্থান এই আঝারপুর। আনন্দ ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গৌরপ্রসাদ ঘোষ এই গ্রামের সন্তান। টোটো হাই রোড ক্রস করে তারকেশ্বর মেমরি রোড ধরল। রাস্তা খুব খারাপ। প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব। রাস্তা সোজা মশা গ্রাম চলে গেছে আমরা ডানদিকে রাস্তা ধরলাম। দূর থেকে দেউলের মাথাটা দেখলাম। আঝারপুর গ্রামের হাটতলা থেকে পূর্ব দিকে দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই "পঞ্চরথ" স্থাপত্যের দেউল। তিরিশ বিঘা জমির উপর এবং জমি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

লোহার গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ডানদিকে নোটিস বোর্ড "উড়িষ্যার রেখ দেউলের আদলে তৈরি ইষ্টক নির্মিত "পঞ্চরথ"। দেউলের উচ্চতা প্রায় আশি ফুট। প্রবেশ দ্বারে ক্রমবর্ধমান খিলানের ব্যবহার। অপূর্ব কারুকার্য এবং বর্হিগাত্রে চৈত্য জানালার সুন্দর বিন্যাস। মন্দির বিগ্রহহীন। অতীতে, এটি কোনও জৈন মন্দির ছিল। আশেপাশে জমি চাষ করার সময় অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। একটি অসাধারণ গল্প আছে এই দেউল নিয়ে, গ্রামের আগে নাম ছিল রাজাপুর, অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে আঝারপুর। মুসলমান যুগে শালিবাহন নামে এক সদগোপ রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যেত কীর্তি নদী। রাঢ় বঙ্গের এক বণিক এই নদী পথে তাদের বাণিজ্য তরী নিয়ে এসে ভাগীরথীতে ঢুকতেন, সেখান থেকে সরস্বতী নদী পথে তারা যেতেন তাম্রলিপ্ত হয়ে দেশদেশান্তরে। এই কীর্তি নদীর পাড়ে ছিল সাত ভাইয়ের বাড়ি। মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য তারা সুন্দর সুন্দর দেউল তৈরি করেন। তারপর বড় ছয় ভাই মাকে গিয়ে বলেন "মা তোমার ঋণ আমরা শোধ করে দিলাম, তুমি খুশি তো"। বলার সঙ্গে সঙ্গে দেউলগুলি ভেঙে পরে। ছোট ছেলে বলে মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না। তাই তার দেউল আজও মাথা উঁচু করে আছে। ঐ সাত দেউল থেকে জায়গায় নাম সপ্ত দেউল বা সাত দেউল।

আঝারপুরের মানুষ বর্ধমানের মহারাজের কাছে মন্দির সংস্কারের জন্য আবেদন করেন। মহারাজা বিজয়চাঁদ ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের সাহায্যে দেউলটির সংস্কার করেন।

কীভাবে যাবেন ঃ মেমারি থেকে বা মশা গ্রাম থেকে আঝারপুর যাওয়া যায়। তবে মশা গ্রাম থেকে কাছে।

বান্দা ঃ রূপসী বাংলায় আদ্রায় নামলাম। প্লাটফর্ম থেকে বের হয়ে রঘুনাথপুরের ট্রেকার ধরলাম। একটা মোড়ে নামিয়ে দিয়ে দিল। ড্রাইভার বলল আপনারা এখানেই দাঁড়ান টোটো পাবেন। আর ঐদিকে চেলিয়ামা। অগত্যা দাঁড়িয়ে রইলাম। টোটো এল, উঠলাম, পলাশের রঙে রাঙানো রাস্তা চিরে টোটো চলছে। রাস্তা কিছু এসে ডান দিকে বেঁকে গেছে। জায়গাটা চেলিয়াম ব্লকের "মৌতড়" গ্রাম। কিছু দূর এগোতেই পেলাম লোকচক্ষুর আড়ালে দাঁড়িয়ে এক অনবদ্য স্থাপত্য। যদিও গরম একটু আছে কিন্তু মন বসন্ত-পলাশের ছোঁয়ায় রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছে। সারি সারি পলাশ, শিমুল — মন বলছে রাঙিয়ে দিয়ে যাও। চোখ অন্য দিকে সরাতেই মুখ থেকে বের হল "আহা"। বিশাল এক দেউল মাথা তুলেই বলছে "বান্দা-র সেলাম নাও ...."। পুরো মন্দির বা দেউলটি পাথরের তৈরি। বর্গাকার ভিত্তি ভূমির উপর তৈরি প্রায় ৭৫ ফুট উঁচু এই দেউল, গায়ে খোদাই করা অপূর্ব সব কাজ। যেমন মানুষ, লতা, গুল্ম, বিবিধ বাদ্য যন্ত্র বাজানোর দৃশ্য ও জলে বসা পাখি প্রভৃতি। ২৫০ ফুট দীর্ঘ্য আর ১৫০ ফুট প্রসস্থ একটি বেদির উপর মন্দিরটি অবস্থিত।

মাথায় চক্রাকার 'আমলক' দেখলে মনে হবে প্রস্ফুটিত পদ্ম। স্থানীয় মানুষ বললেন ঐ আমলকের উপরে কলস আর ধ্বজা দন্ড ছিল। এখন ভেঙে গেছে। দেখলাম পূর্ব দেওয়ালের নীচের অংশে ২ ফুট উচ্চতায় মকর ও হাতির মুখ, যা দিয়ে সেই জল নিষ্কাশন হতো।

নবম দশম শতাব্দীর জৈনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই দেউল। জৈন ধর্মের মহিমা বহনকারী দেউলটি একটি বিশাল চত্বরের উপরে দাঁড়িয়ে। উত্তর মুখের বিশাল অংশ আজও কিছুটা আছে। দেউলটি বিগ্রহহীন। কিন্তু ভিতরে প্রশস্ত বেদি আজও বর্তমান। গর্ভগৃহ পাথর দিয়ে বন্ধ করা। গঠন শৈলীর দিক দিয়ে বান্দার দেউল রেখ বা শিখর প্রকৃতির। এখানে এক সময় নাকি মূর্তি ছিল সেগুলি চেলিয়াম গ্রামের মহামায়া মন্দিরে রাখা আছে। খানিকটা দূরে শুকনো জল হীন নদী বয়ে চলছে। স্থানীয় নাম ডোড় নদী। বান্দার প্রধান ও অন্যতম আকর্ষণ নির্জনতা, অজানা পাখির ডাক। আর বসন্ত হলে? আবির পলাশের মাখামাখি। প্রকৃতি দু'হাতে নিজের রূপ উজাড় করে দিয়েছে। রাত্রিবাসের সুবিধা নেই তাই টোটো রেখে দিতে হবে।

কিভাবে যাবেন ঃ হাওড়া থেকে ট্রেনে আদ্রা। সেখান থেকে ট্রেকারে রঘুনাথপুর, আবার রঘুনাথপুর থেকে টোটো করে বান্দা। হাওড়া থেকে ট্রেনে আসানসোল। আসানসোল থেকে ট্রেনে জয়চন্ডী। সেখান থেকে রঘুনাথপুর তারপর রঘুনাথপুর থেকে বান্দা।

চন্দ্রকেতু গড় ঃ ইতিহাসবিদের মতে মগধ ভেঙে যাবার পর ছোট ছোট জনপদ বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়। চন্দ্রকেতু গড় তাম্রলিপ্তের মতো তেমনই এক বন্দর নগরী। কলকাতা থেকে সামান্য দূরে উত্তর পূর্ব দিকে একদা ভাগীরথী নদীর অন্যতম প্রবাহ পদ্মা নদী ও বিদ্যাধরী নদীর কূল ঘেঁষে এর অবস্থান ছিল। এখনকার 'দে গঙ্গা' গ্রামের রাজপথের সমান্তরাল শুস্ক খাত এখনো দেখা যায়।

তবে হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ নেই। অনেকে মনে করেন উনি দেশে ফেরার কুড়ি বছর পর ভ্রমণকাহিনী লিখতে শুরু করার কারণেই হয়তো এখানকার কথা ভুলে গিয়ে ছিলেন। পাল যুগের একটি বৌদ্ধ মন্দিরও পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন চন্দ্রকেতু বলে এক রাজা ছিলেন যাঁর সম্পর্ক ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-এর সাথে। পোড়া মাটির অনেক শিল্প কর্ম এখানে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে ব্যবহৃত রৌপ্য মুদ্রা। এখান থেকে পাওয়া শিলমোহর-এ মিলেছে পাল তোলা নৌকা আর ঘোড়ার ছবি। অনুমান করা হয় এই বন্দর দিয়ে ঘোড়া রপ্তানি হতো। মাটির তৈরি দুর্গা প্রাচীর প্রত্নস্থলটিকে ঘিরে আছে। পাশেই পাওয়া গেছে খনা-মিহিরের ঢিবি। এই অংশের সঙ্গে ভারতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের সভারত্ন বিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ বরাহমিহির এবং তাঁর পুত্রবধু খনার নামের সাথে যুক্ত। এটাই খনা-বরাহ এর বাসভূমি ছিল। চন্দ্রকেতু গড়ই সম্ভবত পেরিপ্লিস এবং টলেমি সূত্রে উল্লিখিত প্রাচীন গাঙ্গে বা গঙ্গারিডাই মনে করা হয়। দক্ষিণে সাগর দ্বীপে সুন্দরবন থেকে সমগ্র চব্বিশ পরগনা এলাকা জুড়ে গঙ্গার প্রবাহ পথে এই প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল এবং তার রাজধানী ছিল এই চন্দ্রকেতু গড়। এয়ারপোর্ট পর থেকেই শুরু হচ্ছে যশোর রোড মধ্যমগ্রাম, বারাসাত হয়ে টাকী রোড ধরে দেগঙ্গা-বেড়াচাঁপা মোড় থেকে বাঁদিকে চলে গিয়েছে পৃথীবা রোড এর পাশেই ঘনা মিহির ঢিবি। আর ডান দিকে হাড়োয়ার দিকে গেলেই মাটির নিচে চাপা এক সুদীর্ঘ ইতিহাসের আত্মকথন।

নেতাজী স্মরণে

রামকৃষ্ণ বেরা

হে সুভাস, তোমায় করি নমস্কার,
তব ডাকে ভারত জেগেছে পুনর্বার।
তুমি বহ্নিশিখা, শত্রুর বিভীষিকা,
সংগ্রামে হয়েছে যুব স্মরণিকা।
হে নব দিশারী, তুমি উদ্যাম বিভোর,
বহু আশায় গিয়েছিলে সাগর পার।
চেয়েছিলে ভারতেরই চিরমুক্তি
মনেতে তুমি ভরেছো বিপুল শক্তি।
যুবদের মনে গেঁথেছো চির আস্তা,
যুবরাই ধরেছে তোমারই পন্থা।
হে মহান বীর! ফিরে এসো তব ঘরে
তোমার ভারতবাসী মাথাকুটে মরে।

নেতার কথা আমরা মনে রাখবই
শতবর্ষে ঊনিশশো সাতানব্বই।
তেইশে জানুয়ারী বারোটা পনেরয়
উদ্যমে ভারতবাসী শঙ্খ বাজায়।
ঐদিনই জাতীয়কর্মের অবকাশ,
শতবর্ষ পালিছে ভারত, অন্যদেশ।
শুভদিনে হয়েছে মানব বন্ধন
নিশীতে আলোক মন্ধা নাড়ীর টান,
হে মৃতুঞ্জয়ী! তোমারে নমস্কার
তোমার আদর্শ স্মরি বারংবার।
হে মৃতুঞ্জয়ী! তোমারে নমস্কার
তোমার আদর্শ স্মরি বারংবার।

আমার ইচ্ছে

সুনন্দা হাজরা

আমারও ইচ্ছে হয়, হই যেন এক পাখি,
পঞ্চবটির বকুল শাখে করি ডাকাডাকি।
সবুজ গাছের পাতার ফাঁকে ফুলটি হয়ে ফুটি,
রোজ সকালে মাটির পরে করি লুটোপুটি।

আমারও ইচ্ছে হয় বাতাস হয়ে বই,
পাহাড় সাগর সমতলে সবার পাশে রই।
উড়াই দেশের নোংরাগুলোপাঠাই নির্বাসনে,
দুঃখ দৈন্য যাক উড়ে যাক শান্তি আসুক মনে।
ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ে জুড়াই মনের জ্বালা,
দুষ্টুগুলোর বক্ষ ছিঁড়ে করি ফালা ফালা।

আমারও ইচ্ছে হয় হই যেন এক গাছ,
চাইনা হতে দুর্নীতিবাজ গভীর জলের মাছ।
ইচ্ছে মত ছড়িয়ে শাখা করব ছায়াদান,
ক্লান্ত পথিক শ্রান্ত দেহে জুড়াক সেথা প্রাণ।
আমার শাখায় গড়ুক বাসা, যত পাখীর দল,
ভবঘুরে ঘুমাক তলায় বাড়ুক মনের বল।

আমারও ইচ্ছে হয়, হই যেন এক নদী,
আসব ছুটে সবার কাছে হাতটি বাড়ায় যদি।

মুছিয়ে দেব দুঃখ ক্লেশ করব সবে অন্ন দান,
রুক্ষ ভূমি করব সবুজ ফলবে মাঠে সোনার ধান।
আবার কখন প্রলয় হয়ে আনব ডেকে বন্যা,
নষ্ট নারীর মুছিয়ে অশ্রু, করব তারে অনন্যা।

আমারও ইচ্ছে হয়, ভোরের পাখী হই,
গাছের কাছে, ফুলের কাছে, মনের কথা কই।
বৃক্ষরূপী বন্ধু হয়ে নিত্য করি দূষণ রোধ,
স্নিগ্ধ শীতল বায়ু দিয়ে জাগাই সবার বিবেক বোধ।

আমারও ইচ্ছে হয় করি কঠিন শ্রম,
নিজ হাতে বন্ধ করি যত বৃদ্ধাশ্রম।
পিতামাতা থাকবে ঘরে পরিবারের সঙ্গে,
পণপ্রথা বন্ধ হবে এই সোনার বঙ্গে।

আমারও ইচ্ছে হয়, করি হুকুম জারি,
বন্ধ করি কালোবাজার, নকল কারবারী।
কৃষক পাবে ন্যায্য মূল্য বইবে সুখের ঢেউ,
নারী পাচার, শিশু বিক্রি,পার পাবে না কেউ।

হয় না কেন এমনতর ভাবি যাহা মনে,
ভাবনা সকল হারায় পথ আঁধার ঘেরা বনে।

ইন্দ্রপতন ও নতুনত্বের রাশিয়া বিশ্বকাপ

সুরজিৎ দাস

সালটি ২০১৮ অর্থাৎ বিশ্বকাপের বছর, যার জন্য সারা বিশ্ব অপেক্ষা করে থাকে চার চারটি বছর। বিশ্বকাপ মানেই উল্লাস, আবেগ। বিশ্বকাপ জয়ী দলের মুখে থাকে বিশ্ব জয়ের হাসি, অন্য বিশ্বকাপের ব্যর্থ দলের মুখে থাকে বিমর্ষতার ছাপ। বিশ্বকাপ মানেই তো হারা জেতা সমস্ত কিছুই থাকে। কিন্তু এই বছরের বিশ্বকাপটি বিশ্বকাপ ফুটবলে অঘটনের বিশ্বকাপ রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যদিও এবার বিশ্বজয় করে জিদানের ফ্রান্স ঠিক কুড়ি বছর পর। যাই হোক এবার আসা যাক মূল বক্তব্যে।

বিশ্বকাপের ইতিহাস ঃ ফিফা সংস্থা প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজন করে ১৯৩০ সালে। উরুগুয়ে এই বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হাযে ছিল। তারাই প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দল। এই দলের মূল স্তম্ভ হেক্টর কাস্তো, তার আবার ডান হাতটি নেই। এখান থেকে শুরু প্রতি চার বছর অন্তর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বিভিন্ন দেশে। মাঝে দু'বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে (১৯৪২ এবং ১৯৪৬ খ্রী.)। প্রত্যেক বছরই বিশ্বকাপের দলগুলির মধ্যে থেকে উঠে এসেছে কোনো না কোনো তারকা। সেই ব্রাজিলের পেলে থেকে শুরু করে এবছরের কিলিয়ন এমবাপে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম কয়েকবছর দেওয়া হতো জুলে রিমে ট্রফি। কিন্তু ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপের আগে এই ট্রফিটি চুরি হয়ে যায়, যা উদ্ধার করে পিকিলস নামের একটি কুকুর। তার পর থেকে দেওয়া হচ্ছে বর্তমানের এই ২২ ক্যারেট সোনার ট্রফিটি। এখনও পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশী বার জিতেছে ব্রাজিল (৫বার), এছাড়া জার্মান ও ইটালি (৪ বার), আর্জেন্তিনা, ফ্রান্স, উরুগুয়ে (২বার)।

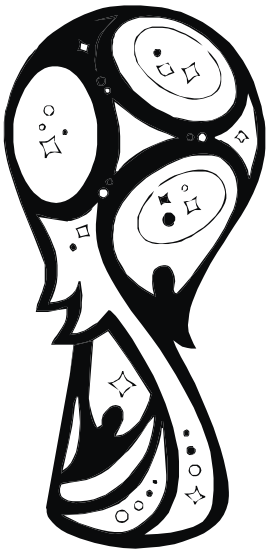

২০১৮ বিশ্বকাপের রঙ্গভূমি ঃ এই বছরের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল লেভ ইয়াসিনের দেশে অর্থাৎ রাশিয়ায়। রাশিয়ার মোট ১২ টি স্টেডিয়ামে, যথাক্রমে মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়াম, যার মধ্যে হয়েছিল বিশ্বকাপের মহারণ ফাইনাল। এছাড়া অন্যান্যগুলি হলো সেন্ট পিটাসবার্গ স্টেডিয়াম, ওতক্রিতি আরিনা, ফিস্ত অলিম্পিক স্টেডিয়াম, কাজেন আরিনা, কসমস আরিনা, রস্তভ আরিনা, ভোলগোগ্রাদ স্টেডিয়াম, নিঝনি নভগরদ স্টেডিয়াম, মার্দোভিয়া আরিনা, ইয়েকা তেরিনবাগ সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম ও কালিনিনগ্রাদ স্টেডিয়াম। এই এক ডজন স্টেডিয়ামের মধ্যে তিনটি স্টেডিয়ামের আমূল সংস্কার করা হয়েছে অন্য দিকে নয়টি স্টেডিয়াম পুরো নতুন ভাবে তৈরি হয়েছে।

বিশ্বকাপের আকর্ষক কিছু ম্যাচ ঃ ১৪ই জুন লুঝনিকি স্টেডিয়ামে এই বিশ্বকাপের প্রথম বাঁশি বাজে। এই ম্যাচে আয়োজক দেশ রাশিয়া সৌদি আরবকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দেয়। ১৫ই জুনের ম্যাচের কথাটি বোধ হয় সবারই মনে থাকবে। এই দিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো একাই লড়ে গেলেন স্পেনের বিরুদ্ধে। তবুও পোর্তুগাল এই ম্যাচ জিততে পারেনি। রোনাল্ডো হ্যাটট্রিক করে ফলাফল করে ৩-৩। ১৭ই জুন আরেকটি আকর্ষক ম্যাচ হয় মেক্সিকো বনাম জার্মানি। এই ম্যাচটিতে জার্মানি সারাক্ষণ আধিপত্য নিয়ে খেললেও ৩৬ মিনিটে হার্ভিং লোজানোর গোলে এগিয়ে যায় মেক্সিকো। কিন্তু টিমো ওয়ার্নার, টোনি ক্রুস, টমাস মুলাররা কেউই গোল শোধ করতে পারলেন না। ম্যাচ শেষ হয় ১-০। ২৩শে জুনের জার্মানি বনাম সুইডেনের ম্যাচটিও হয় মনে রাখার মতো। এই ম্যাচে ম্যাচের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ফলাফল ছিল ১-১ কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে শেষ ৩০ সেকেন্ডে টোনি ক্রুজের ফ্রি কিক থেকে অভাবনীয় গোল এবং জিতে যায় জার্মানি ২-১ গোলে। ২৪ জুন ইংল্যান্ড, পানামার ম্যাচে ইংল্যান্ড গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিক সহ ইংল্যান্ড এই ম্যাচ জয় করে ৬-১ গোলে। ৩০ জুন নক আউট পর্যায়ের খেলায় প্রথম ম্যাচ ফ্রান্সের তরুণ Î ÂÇÂÇÂù ûþ Û÷õ±ÉÂõþæø±ÉÏ Âধ্বংস হয়ে যায় মেসির আর্জেন্তিনা, বেলজিয়াম বনাম জাপানের ম্যাচটিও মন্দ হয়নি, জাপান প্রথমে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও ৩-২ গোলে হার স্বীকার করে। এত কিছুর পরেও ফাইনালে কিন্তু মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া, এই ম্যাচে যেন ক্রোয়েশিয়ার ভাগ্য সহায়

ছিল না। তারা এই ম্যাচ হারে ৪-২ গোলে। বিশ্বজয় করে ফ্রান্স, দিঁদেয়ের দেঁশ হলেন এমন এক মানুষ যিনি খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে দুবারই বিশ্বকাপ জিতলেন।

বিশ্বকাপে অঘটন ঃ এই বিশ্বকাপ কেন অঘটনের বিশ্বকাপ রূপে চিহ্নিত থাকবে তার কতগুলি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। সর্বপ্রথম অঘটন শুরু হয় বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকে যেখানে ইতালি, চিলি, নেদারল্যান্ড-এর মতো দেশে বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠতেই পারেনি। এরপর আসি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের কথায়, জার্মানি এই বিশ্বকাপে করেছে মাত্র ২টি গোল। অন্যদিকে লজ্জাজনকভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে গ্রুপ স্টেজ থেকে গ্রুপে চতুর্থ হয়ে বিদায় নিলো। ব্যর্থ আর্জেন্তিনা, স্পেন, ব্রাজিল যারা হেরেছে অনামী দলের কাছে। সেই দলের থেকে হয়তো তেমন কিছু আশাই করা হয় নি। এবারে চমক দিয়েছে জাপান, সুইডেন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক। অন্য দিকে সকলের নজর কড়েছে লুকা মদ্রিচ-এর ক্রোয়েশিয়া। তারা সকল বাধা টপকে পৌঁছে ফাইনালে। নাই বা তারা চাম্পিয়ন প্রথমবার ফাইনালে উঠে যেভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে তা সত্যিই ভাববার বিষয়।

সোনায় মোড়া খেলোয়াড় ঃ এই বছর সবথেকে বেশী গোল করেছেন ইংল্যান্ডের হ্যারিকেন। তিনি করেন ৬টি গোল এবং পান গোল্ডেন বুট। এই দৌড়ে অবশ্য বেলজিয়ামের রোমেলু লুকাকু এবং পর্তুগালের রোনাল্ডো দু'জনেই করেন ৪টি গোল, সেরা খেলোয়াড় হলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচ তিনি পেলেন গোল্ডেন বল। এই দৌড়েও ছিলেন বেলজিয়ামের ইডেন অ্যাজার এবং ফ্রান্সের আঁতোয়া গ্রিজম্যান, শেষ গোল্ডেন গ্লাভস পান বেলজিয়ামের গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। তিনি ২৭টি সেভ করে এই পুরস্কার অর্জন করেন।

রাশিয়া বিশ্বকাপে নতুনত্ব ঃ রাশিয়ার বিশ্বকাপে নতুনত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছে ভি-এন-আর, ফাউল, পেনাল্টি নিয়ে অনেকসময় বিতর্ক থেকেই যায় তাই সেই সমস্যা দূর করার জন্য এই ব্যবস্থা। এই বছর বিশ্বকাপের বলের নাম ছিল 'টেলস্টার ১৮'। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের ম্যাচ বলের নাম ছিল টেলস্টার। ৫০ বছর পরে এই বল আবার নতুন ভাবে ফিরে এসেছে এই বিশ্বকাপে। এই বিশ্বকাপের ম্যাসকট হিসেবে ছিলো এক নেকড়ে। যার নাম 'জাবিভাকা' - রাশিয়ান এই শব্দের অর্থ যিনি গোল করেন। ২০১০ বিশ্বকাপের পল নামের অক্টোপাসটার কথা মনে আছে? সব ম্যাচের আগে ভবিষ্যৎবাণী করে মিলিয়ে দিচ্ছিল। এবারে সেই জায়গাটা নিয়েছিল অ্যাকিলিস নামের একটি বিড়াল। এছাড়া আরেকটি মজার তথ্য হলো মিশরের এ সাম এল হাদরি, যিনি ৪৫ বছর বয়সে এই বিশ্বকাপে খেলেছিলেন।

শেষের কথা ঃ সব মিলিয়ে এই বছরের বিশ্বকাপ ছিল দারুন, আবার এই আনন্দ ফিরে আসবে চার বছর পরে। তাই চোখ রইল ২০২২-এর কাতার বিশ্বকাপে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের আসর বসবে এশিয়া মহাদেশে।

এগিয়ে চলা

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

অজানা পথের পথিক আমি।
অনেক পথ পার হয়েছি
আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।
যে পথ গিয়েছে চলে
জানি, তা আর ফিরে পাব না।
সামনে ধু ধু প্রান্তর
আর আমার তৃষ্ণাকাতর
দুটি চোখের মলিনতা।
ব্যস্ত চলার পথে শুধু এগিয়েছি
ফিরে যাবার মতো নিশানাহীন।
ফিরতে আমি পারব না।
শুধু এগিয়ে যাবো, শুধু এগিয়ে যাবো
শুধু এগিয়েই যাবো।
এগিয়ে যাবো শুধু যাবার জন্যই।
কেন জানো?
কারণ, এগিয়ে চলার নামই চরৈবেতী
এগিয়ে চলার নামই জীবন
এগিয়ে চলার জন্যই চলা।
আর, এগিয়ে চলার জন্যই আমি।

আমার থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ

সায়নী চ্যাটার্জ্জী

বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে। সুযোগ পেলেই বাবার সঙ্গে গাড়ি নিয়ে কোথাও একটা ঘুরে আসি। এই বেড়ানোগুলো এক-দু দিনের। অনেকটা ছুটি পেলে তখন দিন সাতেকের জন্য বেড়াতে যাওয়া হয়। গত বছর সে রকম একটা ছুটি পেয়ে আমি, মা-বাবা-দাদা'র সঙ্গে থাইল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দোলের দিন সকালে রঙ মেখে, হুল্লোর কারে কাটিয়ে দুপুর বেলা ক্যাবে করে পৌঁছে গেলাম দমদম এয়ারপোর্টে। সবার আলাদা আলাদা ব্যাগ ছিল। আমার একটা ছোট্ট ট্রলি ব্যাগ। তাতেই আমার সব জিনিস। সেটা নিয়ে এয়ারপোর্টে বসে রইলাম। এর আগে দার্জিলিং ও আন্দামান যাওয়ার সময় প্লেনে চেপেছিলাম। কিন্তু, সেগুলো ছিল সব দেশের মধ্যে। এবার যাবো অন্য দেশে। তাই সকলের পাশপোর্ট করাতে হয়েছে। প্রায় দু ঘন্টা পর প্লেন ছাড়ল। থাইল্যাণ্ডে পৌঁছে আমরা আবার প্লেনে উঠলাম। এবার গেলাম ফুকেট। সেখানে তিন দিন থাকা হবে। ফুকেটে প্রথম দিন 'এলিফ্যান্ট সাফারী' করলাম। খুব মজা হল। চকলেট আইসক্রিম খেলাম। সেখান থেকে গেলাম 'টাইগার কিংডম'। সেখানে একটা ছোট্ট বাঘের বাচ্ছাকে কোলে নিলাম। তবে তার আগে আমাদের এক রকমের জামা পরে একটা ঘরে যেতে হল। একটা ঝুড়িতে করে একজন বাঘের বাচ্ছাটাকে নিয়ে এল। ঠিক বেড়ালছানার মত। আমার বয়স কম বলে আমাকে একটা বাঘের ছোট্ট বাচ্ছার কাছে যেতে দিয়েছিল। বাবা ও দাদা চাইলে বড় বাঘের কাছে যেতে পারত, কিন্তু আমার জন্য ওরাও ছোট্ট বাঘটার কাছে গেল। পরের দিন গেলাম 'ফ্যান্টাসিয়া'। সেখানে অনেক মজার মজার খেলা ছিল। আমি অনেকগুলো খেলা খেললাম। ওখানে রেস্টুরেন্টে খেলাম। অনেক রকম সি-ফিশ ছিল। ফুকেট থেকে আবার প্লেনে করে থাইল্যাণ্ডে এলাম। এবার গাড়িতে করে পাটায়া। পাটায়াতে খুব বড় সি-বিচ। অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা নৌকা চাপলাম। আমি আর বাবা একটা নৌকায় উঠলাম। একজন আঙ্কেল নৌকা চালাচ্ছিলেন। পাটায়াতে বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম দেখলাম। ওখানে কচ্ছপের গায়ে হাত দিয়েছি। বড় বড় পেঁচা দেখলাম। আর দেখলাম নানা রকমের সাপ আর গিরগিটি দেখলাম। একটা মোমের মিউজিয়াম দেখলাম। সেখানে অনেকগুলো মোমের মূর্তি ছিল। সবাইকে চিনতাম না, যাদের চিনি না বাবার কাছ থেকে তাদের নাম শুনলাম। সবার নাম মনে নেই। পাটায়াতে যে কদিন ছিলাম আমরা একটা কটেজে ছিলাম। সেখানে থাকতে খুব মজা হয়েছিল। আরো কয়েকটা জায়গায় ঘুরে, কেনাকাটা করে সাত দিন কেটে গেল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। ১৯ মার্চ, সোমবার সকালে এসে নামলাম দমদম বিমানবন্দরে। খুব মজায় কাটল দিনগুলো। এর পরের বেড়ানোর অপেক্ষায় রইলাম।

আমার শিক্ষাগুরু

রাজদীপ ঘোষ

তোমার কাছেই হাতেখড়ি,
প্রথম লেখা শুরু।
তুমিই আমার পরমপিতা,
প্রথম 'শিক্ষাগুরু'।
তুমি বলেছিলে মোরে,
ফলের ভারে নত যে গাছ,
সেই আসল গাছ।
বলতে দ্বিধা নেই আমার —
তুমিই সেই গাছ।

তোমার দেওয়া আশিস যেন —
জীবন ভোর পাই।
তোমার শিক্ষার আদর্শে,
মানুষ হতে চাই।
বড় মাপের মানুষ হয়ে,
রাখবো তোমার মান।
বিশ্বজুড়ে মানুষ তখন,
করবে তোমায় সম্মান।
সর্ব মণি-মুক্তা জুড়ে
হবে তোমার ডাকনাম।

সায়নী চ্যাটার্জ্জী
তৃতীয় শ্রেণী
হেরিটেজ অ্যাকাডেমি, হাওড়া

পিয়ুশা বাগ
প্রথম শ্রেণী
হোলি চাইল্ড গার্লস হাইস্কুল

ঃ ছোটোদের ছবি ঃ

লাভেনা ভৌমিক
তৃতীয় শ্রেণী
অগ্রসেন বালিকা শিক্ষা স

তরুনিমা ভৌমিক
সপ্তম শ্রেণী
অগ্রসেন বালিকা শিক্ষা সদন

জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার সকল পাঠক ও পাঠিকাদের জানাই শারদ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মডার্ণ ডিজিট্যাল স্টুডিও এন্ড জেরক্স সেন্টার

পাশপোর্ট (রঙিন ও সাদা কালো), স্টীল ও ভিডিও ছবি তোলা হয়
এখানে খাতা, পেন, পেনসিল সহ স্কুল সরঞ্জাম ও জেরক্স এর ব্যবস্থা আছে।

বিমল দলুই (৯৭৭৫১৩০৩২০)
জয়পুর মোড় (থানার সামনে), হাওড়া।

Best Wishes for Durga Puja from Subrha Senapati

S. S. Infotech

144, Narashingha Dutta Road,
Kadamtala, 1st. Floor, Howrah - 711101
(Opp. Kadamtala Bus Stand)

(M) 9830236471 (O) 2643 1102
e-mail : subhra_se@yahoo.co.in

প্রয়াস অবলম্বনপরিযায়ী শিশুদের বিদ্যালয়

প্রয়াস একটি অসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ২০০৯ সালে প্রয়াস একটি অভিনব কাজে হাত লাগায়, সেটি হল 'প্রয়াস অবলম্বন পরিযায়ী শিশুদের বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তফশিলী উপজাতির শিশু যাদের বাবা-মায়েরা ইট ভাটার শ্রমিক। এই সব আদিবাসী শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা থেকে কাজের সন্ধানে আসে সঙ্গে আনে তাদের সন্তান সন্ততিদের। এই সব শিশু বা ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় বা বাবা মায়েদের সঙ্গে কাজে সহযোগিতা করে। তাই তাদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রয়াসের এই অভিনব প্রয়াস। প্রয়াসের কাজে উৎসাহিত হয়ে আশা ফর এডুকেশন কলোরাডো, ইউ.এস.এ. চ্যাপ্টার এগিয়ে এসেছে। এদের বদান্যতায় একটা বিদ্যালয় গৃহ তৈরী হয়েছে এ ছাড়া বিদ্যালয় চালানোর আনুষাঙ্গিক খরচ খরচা ওনারাই বহন করেন। তবে আরো তিনটি বিদ্যালয় মুক্তাঙ্গনে চলে এবং হিতৈষীদের দানে চালিত হয়। ইটভাটাগুলোতে ৮মাস কাজ হয়। সাধারন ভাবে নভেম্বর থেকে জুন এই আট মাস। তারপর কাজ থাকেনা বলে সকলে যে যার রাজ্যে ফিরে যায়। নিজের রাজ্যে ৪মাস থেকে আবার কাজের জায়গায় চলে আসে। আমাদের বিদ্যালয়ও তাই আটমাস চলে। বাকি ৪মাসের জন্য প্রয়াস আপাতত ঝাড়খণ্ডে ৮টা বিদ্যালয়ে এবং ১০টা আই.সি.ডি.এস. সেন্টার-এ তাদের ভর্তি করিয়েছে সাথে সাথে ঐসব বিদ্যালয় ও আই.সি.ডি.এস. কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাদের বোঝানো হয়েছে বিষয়টা অর্থাৎ কেন তারা এখানে ৪ মাস পড়বে। অধিকন্তু প্রয়াস কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে ঝাড়খণ্ডের ঐসব বিদ্যালয়ের ও আই.সি.ডি.এস. এর শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রগতি পরিলক্ষণ করেন। সেই সঙ্গে এই সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোচিং এর ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে বাবা-মাদের সাথে প্রতি মাসে মিটিংএর আয়োজন করা হয় ও নির্বাচিত কিছু পরিবারের গৃহ পরিদর্শন করা হয়। এই প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে তাদের মধ্যে কিছু সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে। যেমন —

১. শিশু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
২. শিশু স্বাস্থ্য ও টিকাকরণ।
৩. আধার, রেশন কার্ডের প্রয়োজনীয়তা।
৪. পরিবার পরিকল্পনা।
৫. শিশু বিবাহ রোধ।
৬. অবৈধ শিশু পাচার রোধ।
৭. আর্থিক পরিকল্পনা।
৮. বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প।

Prayas's Culture ----
* Be collaborative
* Be accountable
* Be cost-effective
* Make a difference

এপর্যন্ত আমরা ৭টা ইটভাটায় শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি যদিও আমাদের হাওড়া জেলায় শ্যামপুর (১) ও (২) ব্লকে ২০০টিরও বেশী ইটভাটা আছে। কিন্তু আমাদের সবথেকে বড় কৃতিত্ব হল আমরা ৭টা ইটভাটাকেই শিশুশ্রমিক মুক্ত করেছি। পরিশেষে বলতে চাই, এখনও বহু শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আসুন, দেখুন এবং আমাদের কাজের আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন আশা করি।

প্রয়াস
প্রয়াস
PRAYAS

Progressive Rural Active Youth's Action for Society

www.prayas.bharat.org <> prayasindia.org@gmail.com <>836509314